Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে ন্যায়বিচার : আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাহিদা ফারজানা কলি

রোলঃ 228020719

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে ন্যায়বিচার : আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাহিদা ফারজানা কলি

রোলঃ 228020719

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে ন্যায়বিচার : আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাহিদা ফারজানা কলি, আইডিঃ 228020719 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামে ন্যায়বিচার : আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

নাহিদা ফারজানা কলি

(স্বাক্ষর)

নাহিদা ফারজানা কলি

আইডিঃ 228020719

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

১। ভূমিকা............5

২। ন্যায়বিচার এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ............7

৩। কুরআনের আয়াত............10

৪। হাদিস............17

৫। ন্যায়বিচারের ঘটনা............19

৬। ন্যায়বিচারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা............29

৭। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্র............31

৮। ইসলামের ইনসাফভিত্তিক বিচারবিভাগ............44

৯। সংখ্যালঘুদের সাথে ন্যায়বিচার............49

১০। নারীবাদ ও ইসলামি ন্যায়বিচার............51

১১। আধুনিক সমাজে ন্যায়বিচারের পরিস্থিতি স্বরূপ............57

১২। আধুনিক সমাজে ইসলামি ন্যায়বিচারের প্রয়োগ............63

১৩। আধুনিক যুগের শরীয়াহভিত্তিক দেশ............73

১৪। আশার বানী............75

১৫। মুসলিম উম্মাহর করণীয়............78

১৬। উপসংহার............81

ভূমিকা

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛"

নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদন্ড নাযিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। [1]

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই দুনিয়ায় আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) হতে শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) পর্যন্ত যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং ছহীফা ও আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানব সমাজে ইনসাফ ও শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা। ইনসাফ ও সুবিচারই যে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নবী-রাসুল প্রেরণ ও আসমানি কিতাব নাযিলের প্রধান উদ্দেশ্য তা এই মূল্যবোধকে সবচেয়ে বেশি জোরদার করেছে। ইনসাফের সঙ্গেই কিতাবসমূহ নাযিল করা হয়েছে এবং রাসুলদের প্রেরণ করা হয়েছে। ইনসাফের কারণেই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী টিকে আছে।[2]

নবীজির সিরাত আমাদের উপলগ্ধি করতে সাহায্য করে কত অন্যায় ,জুলুমের মধ্য দিয়ে যে জাহিলিয়াতের যুগ চলছিল; নবীজি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে সেই অস্থিতিশীল সময়ে প্রেরণের মধ্য দিয়ে সকল কালো আঁধার কেটে গিয়ে নতুন আশার আলো দেখে নিপীড়িত মানুষ। নবীজির নৈতিক উপদেশ , শিক্ষা দান , আচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে তিনি ন্যায় ও ইনসাফের পথে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্ঠা করেছেন ।

ইসলামে সুবিচার এর নীতি হলো ভালোবাসা বা শত্রুতার দ্বারা তা প্রভাবিত হয় না। মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই সুবিচার ভোগ করে থাকে। পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা , সম্প্রীতি থাকুক বা শত্রুতা। ইসলামি ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সামাজিক মর্যাদা ও বংশগৌরবের কারণে মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয় না, সম্পদ ও প্রতিপত্তির প্রতিও দৃষ্টি আরোপ করা হয় না। ইসলাম এর সূচনা সকল অন্যায় অবিচারকে ধুয়েমুছে শেষ করার অভিপ্রায় হলেও ফিতনার সূচনা আবার সমাজে ও রাষ্ট্রে মাথা চাড়া দেয় যার ফলে ন্যায়বিচার হয়ে উঠে সোনার হরিণ ! ইসলামের স্বর্ণযুগে ন্যায়বিচারের যে চিত্র পাওয়া যায় তা আজও মানবজাতির জন্য অনুস্মরণীয় ও অনুকরণীয় । আফসোসের বিষয় ; ; আধুনিক সমাজ আজ সেসব তুচ্ছজ্ঞান করে ,অবজ্ঞা এ অবহেলা করে জাহিলিয়াতের সাজে সজ্জিত।মানুষ শান্তি , নিরাপত্তার সাথে সমাজে চলাফেরা

[1] সূরা আল হাদিদ , [৫৭ঃ ২৫]

[2] ড. ইউসুফ আল-কারযাবি, মালামিছল মুজতামাইল মুসলিম আল্লাযি নুনশিদুহ, পৃ. ১৩৩

করার জন্য কত মনগড়া আইন বানায় । কিন্তু , তা কখনও নায়নীতির প্রকৃত মানদন্ড নয়। আল্লাহর কিতাব ভিত্তিক ন্যায়নীতিই হল প্রকৃত ন্যায়নীতি যাতে নেই কোন ত্রুটি বরং তা ইহকাল ও পরকালের জন্য কল্যাণকর এবং সেই ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করাই হল মুমিনের প্রধান কর্তব্য। নবীজি সাঃ যে ইনসাফের মশাল জ্বেলে গেছেন তা রক্ষা করার দায়িত্ব   সরকার ও জনগণ উভয়ের। এই যে বিশ্বে ব্যাপক হিংসা ও হানাহানি তার অন্যতম প্রধান কারণ হল মানুষের মাঝে ইনসাফ না থাকা।

আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রকৃত অর্থে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না কারণ ,সরকারী ও বিরোধী দলের সোচ্চার থাকায় সেখানে সর্বদা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করে। ফলে নিরপরাধ মানুষ বিনা বিচারে ধুকে মরে ,জুলুম- নির্যাতিত হয়। মানুষ নিজের অধিকারের কথা ,হক কথা বলতেও ভয় পায় যদিও তা সত্য । সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি অসম্মানিত হয় পদে পদে। "No Justice, No Peace" — ‘ন্যায়বিচার নেই তো শান্তি নেই’ ১৯৮৬ সালে উদ্ভব হওয়া একটি প্রতিবাদী স্লোগান যা সাধারণত সমাজে বিচারহীনতা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য ব্যবহৃত হয় । গণতান্ত্রিক দেশ সমূহে চরমপন্থার উত্থান এর মধ্য দিয়ে এমন নানা স্লোগানে মুখর হয় দেশ থেকে বিদেশ এর অন্যতম প্রধান কারণ হল কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা ও অবিচার।

ইসলামে রয়েছে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার মূলসূত্র , মূলনীতি । নবীজির জীবন , সাহাবাদের জীবন , খোলাফায়ে রাশেদাদের জীবন থেকে শুরু করে বিখ্যাত মুসলিম শাসক, কাজি সবার জীবনের রয়েছে ন্যায়বিচারের বিস্ময়কর ঘটনা যা আমাদের ইসলামের ন্যায়বিচারের প্রকৃত সৌন্দর্য্য তুলে ধরে । আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে , ইসলাম কেবল একটি ধর্ম না , একটি প্রকৃত জীবনব্যবস্থা। ইসলামে ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রও তাই ব্যাপক । ঘুম থেকে উঠা থেকে শুরু করে ঘুমাতে যাবার আগে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা দেয় ইসলাম । সকল মানুষ হোক সে মুসলিম অথবা অমুসলিম ন্যায়বিচার চাওয়া ও পাওয়ার অধিকার রাখে । কিন্তু , বাস্তবতার কাছে যেন আজ আমরা হার মানতে বসেছি । আধুনিক সমাজে এত পরিমাণ অন্যায় – অবিচার , জুলুম- নির্যাতন যে , মানব রচিত আইন আজ ব্যর্থ জনগণকে ন্যায়বিচার দিতে । আজ মানুষকে ফিরে আসতেই হবে ঐশী বিধানের কাছে এ ছাড়া আর পথ খোলা নেই । কিভাবে এই আধুনিক বিশ্বে ন্যায়ের মশাল জ্বালানো যায় তা প্রতিটি মুমিন মুসলিমকে ভাবতে হবে ও কাজ লেগে যেতে হবে কারণ , আজ দুনিয়া ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে , শান্তি নেই কোথাও । যদিও ইসলামি ন্যায়বিচারের মূল্য বোধ অন্তরে ধারণ করা যায় তবেই অশান্ত এ পৃথিবীতে আবার শান্তি আসবে।

ন্যায়বিচার এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

'আদল' (ইনসাফ) আরবী শব্দ। ইনসাফ ইসলামী শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা । আভিধানিক অর্থ হল সুবিচার করা, সমান করা, নিরপেক্ষতা, বিনিময় প্রভৃতি। আদলের সমার্থক শব্দ হচ্ছে 'ইনসাফ' ও 'কিসত'।. ন্যায়-ইনসাফ অর্থে القسط ও العدل শব্দ দুটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আদলের বাংলা প্রতিশব্দরূপে সুবিচার, ন্যায়বিচার ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। আল্লাহর ৯৯ টি নামের একটি হল আদল। আদল অর্থ ন্যায়পরায়ণ। মহান আল্লাহ হলেন, হাকিম বা ন্যায়বিচারক। তিনি আহকামুল হাকিমিন অর্থাৎ সব বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক। অতএব ,আল -আদল মানে পরিপূর্ণ-ন্যায়বিচারক, নিখুঁত, ন্যায় বিচারক।

শাইখ আস-সাদী রহ. বলেছেন, আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে আরেকটি নাম হলো আল-হাকাম (মহা বিচারপতি, হুকুমদাতা) ,আল-'আদল (ন্যায় বিচারক)। যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে বান্দাকে ন্যায়পরায়নতার সাথে হুকুম দেন, তাদেরকে অনু পরিমাণও যুলুম করেন না, কারো অপরাধ কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেন না, বান্দাকে তার অপরাধের বেশি শাস্তি দেন না, যার যার অধিকার তাকে দিয়ে দেন, কারো অধিকার ক্ষুন্ন করে না। তিনি তাঁর পরিচালনা ও বণ্টনে ন্যায়পরায়ন। আল-হাকাম ও আল-'আদল হলেন যিনি সব কিছুর হুকুম দেন। তাই তিনি তাঁর শরীআতের বিধি-বিধানের হুকুম দেন, ঝগড়াটে ও আপোষকারী সব ধরণের বান্দার জন্য তিনি সব পথ বিস্তারিত ও স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, তাঁর পথসমূহ ন্যায়নীতিবান ও প্রজ্ঞাময়। বান্দা যেসব ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য করেন তিনি সেসব ব্যাপারে চুড়ান্ত ফয়সালা দেন, তিনি তাদের তাকদীরের ফয়সালা করেন, তাঁর হিকমত অনুযায়ী তাদের ব্যাপারে তিনি ফয়সালা দেন, তিনি সব কিছু তার যথাযথ স্থানে স্থাপন করেন, আবার যেটি সেখান থেকে নামানো প্রয়োজন সেটিকে সেখান থেকে নামিয়ে দেন। তিনি কিয়ামত ও হিসাবের দিন তাদের মধ্যে বিচার করবেন, তখন তিনি সত্য ও ন্যায্যভাবে তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। সৃষ্টিকুল তাঁর বিচারের প্রশংসা করবেন; এমনকি যাদের ব্যাপারে শাস্তি নির্ধারিত হবে তারাও তাঁর ন্যায়পরায়নতার সাক্ষ্য দিবে এবং তারা স্বীকার করবে যে, তারা অপরাধী ছিল। তিনি কাউকে অনু পরিমাণও যুলুম করেন না। [3]

ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী জীবন বিধান অনুযায়ী যার যে হক বা অধিকার ও প্রাপ্য তা আদায়ের সুব্যবস্থাকেই আদল বলা হয়। মানুষের জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে তথা কাজ-কর্ম, চলাচল, আচার-আচরণ, লেনদেন, বেচা-কেনা, বিনিয়োগ ব্যবস্থা, সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধ, সন্ধি, সঞ্চয়, ভোগ, বিচার ব্যবস্থায় ইনছাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার নামই আদল,তথা ইনছাফ।

[3] তাওদীহুল কাফিয়া আশ-শাফিয়া, পৃ. ১২৭; আল-হাক্কুল ওয়াদিহ আল-মুবীন, পৃ. ৮০

মুসলিম স্কলার বা পণ্ডিতগণ "ইনসাফ" কে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন ঃ

আল মাওয়ারদি (মৃত্যু ৪৫০ হি./ ১০৫৮ খ্রি.) লিখেছেন, 'ইনসাফ সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করে; এটি মানুষকে নিয়ম ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে; এটি সমাজ ও দেশকে উন্নতির দিকে চালিত করে; ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদের বৃদ্ধি ঘটায়; ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত করে; জাতির নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বকে সংহত করে'। তিনি আরও লিখেছেন, 'বেইনসাফি এবং জুলুম সমাজ, রাষ্ট্র, পৃথিবী এবং মানুষের বিবেককে ধ্বংস করে।[4]

ইবন তাইমিয়া (মৃত্যু ৭২৮ হি./১৩২৮ খ্রি.) বলেছেন, 'ইসলামি সমাজব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা জরুরি। যেকোনো ব্যক্তি, গোত্র বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবিচার বা জুলুম বন্ধ বাপ্রতিহত করতে হবে। এই ন্যায়বিচার মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার প্রাপ্য: এমনকি জালিম-অবিচারকারীকেও ন্যায়বিচার করতে হবে।[5]

ন্যায়বিচার বা ইনসাফ প্রসঙ্গে ইবন তাইমিয়া আরো একটি জ্ঞানগর্ভ উক্তি করেছেন। তা হচ্ছে, 'আল্লাহ ন্যায়-নীতি ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজ বা রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখেন; এমনকি যদি তা অমুসলিমদের রাষ্ট্রও হয়। অন্যদিকে একটি মুসলিম রাষ্ট্রও আল্লাহর অভিশাপে ধ্বংস হয় যদি তা ন্যায়বিচার কায়েমে ব্যর্থ হয়।[6]

ইবন খলদুন (মৃত্যু ৮০৮ হিজরি/ ১৪০৬ খ্রি.) দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন যে, ন্যায়বিচার বা ইনসাফ কায়েম করা ছাড়া একটি দেশের উন্নতি করা সম্ভব নয়। [7]
বিশিষ্ট্য মুফাসসির আবু হাফস আদ-দিমাশকি বলেছেন, 'ইনসাফের প্রকৃত অর্থ হলো, সমান অর্ধেক অংশে ভাগ করে দেওয়া। কারণ যুক্তির নিরিখে কর্তব্য হচ্ছে, নিজের ওপর যেন জুলুম না হয়, তেমনি অন্যের ওপরও জুলুম না হয় সেটা নিশ্চিত করা। আর এটা সম্ভব হয় সমান দুই ভাগে ভাগ করলে। যেন নিজের ও অন্যের মধ্যে সমতা স্থাপিত হয়।' (আল-লুবাব ফি উলুমিল কিতাব: 8/১৩৮) ।https://www.kalbela.com/ajkerpatrika/joto-mot-toto-path/106006

---

[4] Al-Mawardi, Adab, ১৯৫৫, পৃ: ১২৫

[5] Ibn Taymiyyah, Majmu Fatawa, ভল্যুম-৮, পৃ: ১৬৬। আরও দেখুন Minhaj al-Sunnah, ১৯৮৬, ভল্যুম-৫, পৃ: ১২৭।

[6] Imam Ibn Taymiyyah, Al-Hisba fi al-Islam, ১৯৬৭, পৃ: ৯৪।

[7] Ibn Khaldun, Muqaddimah, পৃ: ২৮৭, 'বেইনসাফি এবং অবিচার উন্নয়নকে ধ্বংস করে'।

আদল বা ইনসাফকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ব্যক্তিগত ইনসাফ ও সামাজিক ইনসাফ।

ব্যক্তিগত ইনসাফ :

নিজের হক ও অধিকারকে পূর্ণরূপে আদায় করা এবং অন্যের প্রাপ্য ও অধিকারকে পূর্ণরূপে প্রদান করার নাম ব্যক্তিগত ইনসাফ। যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমাজের একজন সদস্য, তাই সামাজিক প্রতিটি খাত থেকে তার উপকৃত হওয়ার অধিকার রয়েছে। সামাজিক খাত থেকে তার নিজের প্রাপ্য যথাযথভাবে বুঝে নেওয়া এবং অন্যের প্রাপ্য সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার নামই আদল বা ইনসাফ। এ কারণেই চুরি-ডাকাতি, হাইজ্যাক-ছিনতাই, চাঁদাবাজি ইত্যাদি অত্যাচার বলে বিবেচিত। কেননা এতে অন্যকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। যে ব্যবসায়ী নির্ধারিত ওযনের চেয়ে মাপে কম দেয়, সে অত্যাচারী। কেননা সে অন্যের হক বিনষ্ট করে।

সামাজিক ইনসাফ :

সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে তার প্রাপ্য সামাজিকভাবে যথাযথভাবে প্রদান করাই হচ্ছে সামাজিক ইনসাফ। সুতরাং ইনসাফভিত্তিক সমাজ বলতে সে সমাজকে বুঝায় যার নিয়ম-নীতি ও আইন-কানূন এত সরল-সহজ যে, সমাজের প্রত্যক ব্যক্তি নিজের যোগ্যতানুসারে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই নিজের ও সমাজের উন্নতি সাধন করতে পারে। সুতরাং কোন সমাজকে ততক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বলা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সমাজে সকল শ্রেণীর মানুষের উন্নতির উপায়-উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান না থাকবে। [8]

ন্যায়বিচারের আবার তিনভাগে ভাগ করা যায় যথা ঃ সামাজিক ন্যায়বিচার, রাজনৈতিক ন্যায়বিচার এবং আইনগত ন্যায়বিচার।সাইয়েদ কুতুবের ক্ষেত্রে 'সামাজিক ন্যায়বিচারের' ধরন বা শ্রেণীটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তার গ্রন্থে সামাজিক 'ন্যায়বিচার'কে অর্থনৈতিক-ব্যক্তিগত-সরকারি সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এবং এগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে; উপরন্তু আইনি ব্যবস্থাকেও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; যদিও সুনির্দিষ্টভাবে নয়; অর্থাৎ সাইয়েদ কুতুব বলতে চেয়েছেন, এ সব কিছুর সমন্বয়েই কেবল সামাজিক ন্যায়বিচার হতে পারে। [9]

---

[8] https://ifatwa.info/7616/

[9] নোয়াহ ফেল্ডম্যান ,ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ও পুনরুত্থান , পৃ ১৫১

অতএব , আদল এমন এক মধ্য-পন্থা অবলম্বন করা যার ফলে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক যাবতীয় কথা ও কাজে কম বা বেশি করা হয় না । আল্লাহর নির্দেশিত কুরানিক বিধান অনুযায়ী বা সুন্নাহ অনুযায়ী , যার যতটুকু
হক্ক ও অধিকার আছে, তা আদায়ের পরিপূর্ণ নীতিমালা ও সুব্যবস্থা করার নীতিই হলো আদল বা ইনসাফ ।

কুরআনের আয়াত

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অনেকগুলো আয়াতেই ইনসাফ এর কথা বলেছেন । শুরুতেই বলা হয়েছে , দুনিয়ায় নবী রাসূল এসেছেন , ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে। আল্লাহ দাউদ আঃ কেও জমিনে খেলাফত দানের পাশাপাশি সেখানের লোকদের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِي

হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। সুরা ছোয়াদ [৩৮ ঃ২৬]
আল্লাহ কুরআনেভকখনো ন্যায়বিচারের নির্দেশ , কখনো ন্যায়বিচারকারীকে ভালোবাসার কথা অথবা , ন্যায়বিচারের পথে প্রতিবন্ধকতা নিয়ে কথা বলেছেন । আবার , জুলুমকারী বিষয়েও সতর্ক করেছেন।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্নীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। সুরা নাহল [১৬ঃ ৯০

اِنَّ اللّٰهَ يَاۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهۡلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمۡتُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمۡ بِهٖ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيۡعًۢا بَصِيۡرًا

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যার্পণ করবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-কার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে

বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন, তা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" সূরা নিসা [৪ঃ৫৮]

মানুষের মাঝে বিচার করার সময় একটি মূলনীতি হলো , অবশ্যই ন্যায়ভিত্তিক বিচার করতে হবে।এটা আল্লাহর উপদেশ যা মানতেই হবে। মহান আল্লাহ এমনকি জালিমদের প্রতিও জুলুম করেন না । আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

"আর যমীনে যা রয়েছে, তা যদি প্রত্যেক যুলুমকারী ব্যক্তির হয়ে যায়, তবে সে মুক্তির বিনিময়ে সেসব দিয়ে দেবে এবং অনুতাপ গোপন করবে যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। আর তাদের মীমাংসা ন্যায়ভিত্তিক করা হবে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।" সূরা ইউনূস [১০ঃ৫৪]

এ বিশ্বের মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীন হলে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক । তিনিওই উত্তম ন্যায়বিচারক । তাই তো আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন ,

“আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?” সূরা ত্বীন [৯৫ ঃ ৮]

এরপর আল্লাহ তার ভালোবাসার কথাও ব্যক্ত করেন । যারা সুবিচারকারী মহান আল্লাহ তাদের খুব ভালোবাসেন।তাদের কথা কুরআনের আয়াতে স্পষ্ট করে উল্লেখও করেছেন।

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

মুসলিমদের দু’ টি দল আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তবে যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যাবত না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং যদি ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা করে দিও এবং (প্রতিটি বিষয়ে) ইনসাফ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। সূরাঃ আল হুজুরাত [৪৯ঃ ৯]

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। মায়েদা [৫ঃ ৪২]

ইসলামের ন্যায়বিচার এত সুদৃঢ় যে ,অপরের সঙ্গে শত্রুতার কারণে যা কারো ওপর অন্যায় করা না হয় তার নির্দেশ ও দেয়া হয়েছে। কাফের-অমুসলিমও যদি হয় যদি আল্লাহর ঘোর দুশমন, তার সাথেও ন্যায়-ইনসাফ রক্ষা করা অপরিহার্য। তাদের প্রতি বেইনসাফীর আচরণ করা হলে তা হবে ইসলামী শরীআতের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡا قَوّٰمِيۡنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالۡقِسۡطِ‌ ۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَاٰنُ قَوۡمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعۡدِلُوۡا‌ ؕ اِعۡدِلُوۡا ۚ هُوَ اَقۡرَبُ لِلتَّقۡوٰى‌ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ

"হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষাদানে তোমরা অবিচল থাকবে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার অর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।" সূরাঃ আল মায়িদাহ [৫ঃ ৮]

এ আয়াতের তাফসীরে 'আল্লামা হাফিয ইবন কাছীর রহ. বলেন,

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মুমিন বান্দাদের ন্যায়ের সাক্ষীরূপে অবিচল থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তারা ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুত হয়ে ডানে বা বামে যেতে পারবে না। তাদেরকে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন নিন্দুকের নিন্দা প্রভাবিত করবে না, কোন বাধাদানকারী বিরত রাখতে পারবে না। আর তারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে।[10]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্নীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্খী তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কেই অবগত। সুরা নিসা আয়াত [৪ ঃ১৩৫]

[10] ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, রিয়াদ: দারু তাইবাহ্ লিন নাশর ওয়াত তাওযী', ২য় প্রকাশ, ১৯৯৯, খ. ২, পৃ. ৪৩৩

মানবসমাজে শ্রেণীবৈষম্য নতুন কোন বিষয় নয় যা জুলুমের রাস্তা খুলে দেয় আর ইনসাফের পথ আটকে দেয় । উক্ত আয়াতে 'ধনী ও গরীবের ' কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যাতে এর দ্বারা ন্যায়বিচার কোনভাবে প্রভাবিত না হয়। ক্ষমতাবান ব্যক্তির সর্বদা নিজেদের দলপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতির ফলে কৃত বে-ইনছাফীর কথা কৌশলে এড়িয়ে যেতে চায়।'ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বলা এবং পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কথা এজন্য বলা হয়েছে । কিন্তু, যিনি এ বিশ্বের স্রষ্টা ; মানুষের অন্তরের খবরও জানেন সেই মহান আল্লাহর চোখকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। আল্লাহর তরফ থেকে মানজাতির জন্য এট এক সতর্ক বার্তা।

এখানে লক্ষনীয় যে , ইনছাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসাবে আল্লাহ পাক দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। এক- আত্মীয়তা এবং দুই- দলীয়তা। আত্মীয়তার বিষয়টি সূরা নিসার ১৩৫ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং, আল্লাহ সূরা মায়েদায় বলেন , অপর প্রতিবন্ধকতার কথা – দলীয়তা ।অতএব ,আলোচ্য সূরা নিসা ও একই মর্মের সূরা মায়েদায় বর্ণিত আয়াত দুটির মর্মকথা হল (১) আত্মীয়-অনাত্মীয় বা শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার প্রতি ন্যায়নীতি ও সুবিচারে অটল থাকা এবং (২) আল্লাহর জন্য সত্য সাক্ষ্য দেওয়া, যাতে সুবিচার সম্ভব হয়।

জাহেলী যুগে আরবদের মধ্যে দলপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতি ব্যাপকহারে বিদ্যমান ছিল। উপরে বর্ণিত দুটি প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ আত্মীয়তা ও দলীয়তা হ' তে মুক্ত হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তারা পরস্পরে যেমন আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ, তেমনি আত্মরক্ষার তাকীদে কিংবা নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য হাছিলে দল গঠন করাও তার স্বভাবজাত। এ দু ' টির ভাল দিককে ইসলাম সর্বদা উৎসাহিত করেছে। কিন্তু খারাপ দিককে নিন্দা করেছে। যেমন- বাপ-দাদার দোহাই পেড়ে ইসলাম কবুল না করা (বাক্বারাহ ২/১৭০) ও দলের দোহাই দিয়ে সত্যকে চিনেও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া (বাক্বারাহ ২/১৪৬)। ইহূদী-নাছারারা ইসলামের সত্য বুঝেও তা কবুল করেনি। অন্যদিকে আল্লাহ আত্মীয়তার বন্ধনকে সর্বদা মযবুত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন যতক্ষণ না তা আল্লাহ প্রদত্ত সীমালংঘন করে (ইসরা ১৭/২৬)। একইভাবে তিনি দলীয় পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখার অনুমোদন দিয়েছেন যতক্ষণ তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। যেমন আনছার ও মুহাজির নামের দলীয় পরিচয় আল্লাহ স্বয়ং কুরআনেই উল্লেখ করে তাদের প্রশংসা করেছেন (তওবা ৯/১০০)। আত্মীয়তা রক্ষা করা ও দলীয়তা বজায় রাখা তখনই নিষিদ্ধ হবে, যখন তা স্রেফ দুনিয়াবী কোন হীন স্বার্থে হবে এবং তার লক্ষ্য 'হাবালুললাহ' কে বাদ দিয়ে 'হাবলুশ শয়তান' -কে আঁকড়ে ধরা হবে। '' অত্র আয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, যখনই কোন দল বা সংগঠন হাবলুল্লাহকে বাদ দিয়ে স্রেফ

ব্যক্তি পূজা ও অনৈসলামী আদর্শ পূজায় লিপ্ত হবে, সেই দল বা সংগঠন থেকে ঈমানদার ব্যক্তিকে বেরিয়ে আসতে হবে।[11]

اِنَّ اللّٰهَ يَاۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهۡلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمۡتُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمۡ بِهٖ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيۡعًاۢ بَصِيۡرًا

আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করো, তখন ন্যায়বিচার করো। অবশ্যই আল্লাহতায়ালা তোমাদের উত্তম উপদেশ দান করছেন।' সূরা নিসা, [৪: ৫৮]

যেহেতু আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক সেহেতু তিনি তার বান্দার প্রতি জুলুম করবেন না হোক তা ইহকালে কি পরকালে । এ বিশ্বাস প্রতিটি মুমিন অন্তরে লালন করেন । আল্লাহ এ বিষয়ে ঘোষণা দেন যে ,

ؕوَنَضَعُ الۡمَوَازِيۡنَ الۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ الۡقِيٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٌ شَيۡـًٔا‌ؕ وَاِنۡ كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٍ مِّنۡ خَرۡدَلٍ اَتَيۡنَا بِهَا‌ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيۡنَ

আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট। সুরা আম্বিয়া ৪৭
সূরাঃ আল আম্বিয়া [২১ঃ ৪৭]

এ আয়াত স্পষ্ট জানাচ্ছে, কিয়ামতের দিন কেবল এতটুকুই নয় যে, সমস্ত মানুষের প্রতি ইনসাফ করা হবে, বরং সে ইনসাফ যাতে সমস্ত মানুষের নজরে আসে সে ব্যবস্থাও করা হবে। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা সর্বসমক্ষে তুলাদণ্ড স্থাপন করবেন। তাতে মানুষের আমল পরিমাপ করা হবে এবং আমলের ওজন অনুসারে মানুষের পরিণাম স্থির করা হবে। মানুষ যে আমলই করে, দুনিয়ায় যদিও তার কোন বস্তুগত অস্তিত্ব দেখা যায় না এবং তার কোন ওজনও অনুভূত হয় না, কিন্তু আখেরাতে আল্লাহ তাআলা পরিমাপের এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যা দ্বারা আমলের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট হয়ে যাবে। মানুষ যদি শীত ও তাপ মাপার জন্য নতুন-নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়, মানুষের স্রষ্টা বুঝি তাদের কর্ম পরিমাপের ব্যবস্থা করতে পারবেন না? আলবত পারবেন। তিনি অসীম ক্ষমতার মালিক। [12]

[11] প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ইনছাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা, মাসিক আত – তাহরীক
[12] তাফসীর করেন মুফতি তাকী উসমানী

যেসব অমুসলিম মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তাদেরকে কোনওভাবে কষ্টও না দিয়ে বরং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা ও ইনসাফ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলাম যেভাবে অমুসলিম বা সংখ্যালঘুদের অধিকারকে সংরক্ষণ করে অন্য কোন ধর্মে এর নজির পাওয়া যায় না।

لَا يَنۡهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيۡنَ لَمۡ يُقَاتِلُوۡكُمۡ فِى الدِّيۡنِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوۡكُمۡ مِّنۡ دِيَارِكُمۡ اَنۡ تَبَرُّوۡهُمۡ وَتُقۡسِطُوۡۤا اِلَيۡهِمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُقۡسِطِيۡنَ

ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। সুরা মুমতাহিনা [৬০ঃ৮]

وَلَا تَقۡرَبُوۡا مَالَ الۡيَتِيۡمِ اِلَّا بِالَّتِىۡ هِىَ اَحۡسَنُ حَتّٰى يَبۡلُغَ اَشُدَّهٗ‌ ۚ وَاَوۡفُوا الۡكَيۡلَ وَالۡمِيۡزَانَ بِالۡقِسۡطِ‌ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا اِلَّا وُسۡعَهَا‌ ۚ وَاِذَا قُلۡتُمۡ فَاعۡدِلُوۡا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبٰى‌ ۚ وَبِعَهۡدِ اللّٰهِ اَوۡفُوۡا‌ ؕ ذٰ لِكُمۡ وَصّٰٮكُمۡ بِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُوۡنَۙ

ইয়াতীম পরিপক্ক বয়সে না পৌঁছা পর্যন্ত তার সম্পদের নিকটেও যেয়ো না, তবে এমন পন্থায় (যাবে, তার পক্ষে) যা উত্তম হয় এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায়ানুগভাবে পরিপূর্ণ করবে। আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেই না। ৯৩ এবং যখন (কোনও কথা) বলবে, তখন ন্যায্য বলবে, যদিও নিকটাত্মীয়ের বিষয়ে হয়। আর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে। ৯৪ আল্লাহ এসব বিষয়ে তোমাদেরকে গুরুত্বের সাথে আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। সূরাঃ আল আনআম – [৬ঃ১৫২]

وَاَقِيۡمُوا الۡوَزۡنَ بِالۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُوا الۡمِيۡزَانَ

আর তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে ওযন প্রতিষ্ঠা কর এবং ওযনকৃত বস্তু কম দিও না। সূরাঃ আর রহমান –[৫৫ঃ ৯]

وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ

বলুন, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। সূরা আশ- শূরা [৪২ঃ ১৫]

যারা ন্যায়বিচার করে না তারাই জুলুম করে অন্যর ওপর। জুলুমের শাস্তির ভয়াবহতা ব্যাপক তার যারা এরূপ করা তারা ব্যর্থ । আবার, আল্লাহ এও বলেছেন , আমানতের খেয়ানতকারীর পক্ষ না নিতে কারণ সেও এক প্রকার জুলুম করে ।অন্যর হক নষ্ট করে। সুরা মায়েদার

৪৪,৪৫,৪৭ আয়াতে যারা আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ফয়সালা না করে তাদের কাফের, জালেম ও পাপাচারী সম্ভোধন করা হয়েছে।

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا

সেই চিরঞ্জীব চিরস্থায়ীর সামনে সব মুখমন্ডল অবনমিত হবে এবং সে ব্যর্থ হবে যে জুলুমের বোঝা বহন করবে। সূরা ত্বহা [২০ ঃ ১১১]

وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষাবলম্বনকারী হয়ো না। সুরা নিসা [৪ঃ১০৫]

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

তারা আপনার কাছে নারীদের বিবাহের অনুমতি চায়। বলে দিনঃ আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে অনুমতি দেন এবং কোরআনে তোমাদেরকে যা যা পাট করে শুনানো হয়, তা ঐ সব পিতৃহীনা-নারীদের বিধান, যাদের কে তোমরা নির্ধারিত অধিকার প্রদান কর না অথচ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার বাসনা রাখ। আর অক্ষম শিশুদের বিধান এই যে, এতীমদের জন্যে ইনসাফের উপর কায়েম থাক। তোমরা যা ভাল কাজ করবে, তা আল্লাহ জানেন। সুরা নিসা [৪ঃ১২৭]

কুরআন এর উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা এটা প্রতীয়মাণ হয় যে, বিচার এর সময় ব্যক্তিগত পছন্দ – অপছন্দকে দূরে সরিয়ে অবশ্যই ন্যায়বিচার ও সঠিক ফয়সালা করা আবশ্য। শাসক ,কাজি যিনি বিচার করেন না কেন কুরআনের আয়াতগুলোকে অন্তরে ধারণ করতে হবে। ইসলাম ন্যায়বিচারের

যে মানদন্ড নির্ধারণ করেছে তা অবশ্যই খেয়াল রেখে ফয়সালা করতে হবে। আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার এক মাধ্যম হলো ইনসাফ।

হাদিস

ইসলামের ২য় উৎস হাদিস বা সুন্নাহতেও এই বিশ্বের মানুষের জন্য ন্যায়বিচারের নির্দেশ আছে। নবীজি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ বিশ্বনেতা। আদল বা ইনসাফ মূলত কি , এর গুরুত্ব কতটুকু , এর ফজিলত কি , কেন একজন মুমিন মুসলিম অন্তরে ইনসাফের বীজ বুনবেন তা নিম্নোক্ত হাদিস থেকে অনুধাবন করা সম্ভব।

আবু সাইদ এ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

إن أحب النابي إلى الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامُ عادل، وأبعض الناس إلى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ تَجْلِسًا إِمَامُ جَائِرٌ

'ন্যায় বিচারকগণ (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তাআলার নিকটে নুরের মিম্বারে মহামহিম দয়াময় প্রচুর ডানপাশে উপবিষ্ট থাকবে-আর তাঁর উভয় হাতই ডান হাত (তথা সমান মহিয়ান) যারা তাদের শাসনকার্যে তাদের পরিবারের লোকদের ব্যাপারে ও তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে সুবিচার করে।'[13]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤْلُؤٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنْيَا .

দুনিয়াতে ইনসাফকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন ইনসাফের বদৌলতে আল্লাহর সামনে মুক্তোর মিম্বরে আসন লাভ করবে। [14]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল রা.-কে বলেন,

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

এবং বেঁচে থাকবে উৎপীড়িতের বদদোয়া থেকে। কেননা, উৎপীড়িতের বদদোয়া এবং আল্লাহর মধ্যে কোনো আড়াল নেই। [15]

---

[13] সহিহুল মুসলিম ঃ ৩/১৪৫৮ হা, নং ১৮২৭, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি , বৈরুত

[14] সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৮২৭; সুনানুন নাসায়ি, হাদিস: ১৮২৭, মুসনাদু আহমাদ, হাদিস: ৬৪৮৫

[15] বুখারি, হাদিস নং ৪০০০; মুসলিম, হাদিস নং ২৭

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ :الصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوم يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، وتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُوْلُ الرَّبُ :وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না: রোযাদারের দোয়া, 'যখন সে ইফতার করে; ন্যায়বিচারক শাসকের দোয়া এবং মাজলুমের দোয়া। আল্লাহ তার দোয়া মেঘের ওপর উঠিয়ে নেন এবং তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং রব বলেন, আমার ইজ্জত-সম্মানের কসম, নিশ্চয় আমি তোমাকে সাহায্য করব, যদিও কিছু সময় পরে হয়। [16]

ইনসাফের বিপরীতে আছে জুলুম। ইসলাম সুবিচার ও ইনসাফের প্রতি যেমন উদ্বুদ্ধ করেছে, জুলুমকেও কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবং প্রচণ্ডভাবে প্রতিরোধ করতে বলেছে। নিজের প্রতি জুলুম হোক, বা অন্যদের প্রতি এটা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ । আমাদের সমাজে অহরহই দেখা য় দুর্বলদের ওপর শক্তিমানদের জুলুম এবং দরিদ্রদের ওপর ধনীদের জুলুম এবং শাসিতদের ওপর শাসকদের জুলুম যা দুনিয়ার বড় বড় আইনে বিচার করেও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না । ইসলামে এ জুলুম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। হাদিসে কুদসিতে রয়েছে (আল্লাহ তাআলা বলেন),

يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا

تَظَالَمُوا

হে আমার বান্দারা, আমি নিজের ওপর জুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের মধ্যেও জুলুম হারাম সাব্যস্ত করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর জুলুম করো না। [17]

জাবির থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ও বলেন।

القوا العلم، فإن العلم اللمَاتُ يَوْمَ القيامة

[16] (তিরমিযি, কিতাব: আদ-দাওয়াত, বাব আল-আফউ ওয়াল-আফিয়া, হাদিস নং ৩৫৯৮, ইমাম তিরমিযি বলেছেন, এটা হাসান হাদিস। ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৭৫২; আহমাদ, হাদিস নং ৮০৩০। শুআইব আরনাউত বলেছেন, এটি সহিহ হাদিস।)

[17] (মুসলিম, আবু যর রা. থেকে বর্ণিত হাদিস, কিতাব আল-বিরু ওয়াস-সিলাতু ওয়াল-আদাব, বাব: তাহরিমুয-যুলম, হাদিস নং ২৫৭৭; আহমাদ, হাদিস নং ২১৪৫৮: বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৪৯০)

'তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, জুলুম কিয়ামতের দিন কালো অন্ধকার হয়ে আসবে।'[18]

আওফ বিন মালিক এ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

خبار امتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَبْتَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وينفضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُم

'আমি রাসুলুল্লাহ এ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমাদের সর্বোত্তম শাসক হলো তারা, যাদের তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে। তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং তারাও তোমাদের সাথে মিলিত হয়। আর তোমাদের সর্বনিকৃষ্ট শাসক হলো তারা, যাদের তোমরা ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে। তোমরা তাদের লানত করো এবং তারাও তোমাদের লানত করে।[19]

ন্যায়বিচারের ঘটনা

মুসলিম ইতিহাসে ন্যায়বিচারের ঘটনাগুলো আজকে আধুনিক সমাজের মানুষদের জানা খুব প্রয়োজন। ইসলামের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল ন্যায়বিচারের ছোঁয়া । মুসলিমদের পতনের পর থেকে ধীরে ধীরে সমাজ থেকে সেই ইনসাফের বোধ হারিয়ে যেতে থাকে আজ তাই আমরা দাড়িয়ে আছি এক জাহিলিয়াতের যুগে।ন্যায়বিচারের ঘটনাগুলো নিছক মুসলিম খলিফাদের গুণাগুণ ও ন্যায়-ইনসাফের প্রদর্শনী নয়, বরং শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের আলোকে প্রমাণিত মুসলিম শাসকদের বাস্তব চরিত্রের প্রতিফলন বলা যায়।

নবীজি (সাঃ) এর ন্যায়বিচার

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ইনসাফের মূর্ত প্রতীক।জন্মের শুরুলগ্ন থেকেই মহান আল্লাহ ইনসাফের বীজ নবীজির অন্তরে ও স্বভাবে বুনে দেন।সাহাবা কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম সরাসরি বিশ্বনেতার কাছে ইনসাফের মর্ম বানী শিখেছেন; সমাজে ইনসাফের মূল্য কেমন ,কিয়ামতের কঠিন দিবসে এর প্রতিদান কত বিশাল তার দীক্ষা দিয়েছেন স্বয়ংসম্পূরণভাবে । আর, এভাবেই সাহাবা কিরামের হৃদয়ে ইনসাফের শেকড় গেড়ে দেয়া

[18] সহিহ মুসলিম ৪/১৯৯৬,হা , নং ২৫৭৮ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল ,আরাবিয়্যি , বৈরুত)
[19] (সহিহ মুসলিম ৩/১৪৮১,হা , নং ১৮৫৫ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি , বৈরুত) – হাদিসটি হাসান।

হয়েছিল যা আজও বিশ্বের কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাহাবা কিরাম নবিজির নির্দেশ বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন।

বাল্যকাল থেকে আমাদের নবীজির সদাচারণ মানুষের মুখে মুখে। সততা , ন্যায়পরায়ণতা এসব এর ক্ষেত্রে ঐ সময়ে নবীর মত আর কেউ ছিল না। আর , এটাই হবার ছিল কারণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্যই এই ধরণীতে নবীজির আগমণ। তাই, কুরাইশরা কাবার দেয়ালে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে যখন মতবিরোধে লিপ্ত, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিল তাদের সবচেয়ে প্রিয় আস্থাভাজন ব্যক্তি। তারা নবীকে ইনসাফকারী হিসেবে গ্রহণ করে। তাঁর মীমাংসায় সন্তুষ্ট হয় কুরাইশবাসী। অথচ নবিজির গোত্র হাশিমও ফয়সালায় শরিক ছিল। এখানে যে, স্বজনপ্রীতি এর আশ্রয় নেয়া হবে না তা তারা জানতেন।নবিজির ইনসাফের প্রতি শতভাগ আস্থা ছিল বলে তাঁকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে বিনাদ্বিধায়।

হিলফুল ফুযুল

নবুওয়্যাতপ্রাপ্তির আগে, আবদুল্লাহ ইবনু জুদআনের ঘরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি সংগঠন; নাম - হিলফুল ফুজুল'। কুরাইশ যুবকদের নেতৃত্বে পরিচালিত মজলুমদের সাহায্য-সংগঠন ছিল এটি। সংগঠনটির এই নামের কারণ তারা শপথ করেছিল, যে ব্যক্তির কাছেই জুলুমকৃত অতিরিক্ত সম্পদ কুক্ষিগত থাকবে, সেগুলো মাজলুমের জন্য আলিমের কাছ থেকে উদ্ধার করবে। হিলফুল ফুজুলের শাব্দিক অর্থ হলো-অতিরিক্ত আদায়ের শপথ। কেউ কেউ বলেছেন-এই নামকরণের কারণ হলো, এ সংগঠনটি মক্কার প্রাচীন জাতি বনু জুরহুমের ইনসাফ, দুর্বল ও গরিবদের জন্য শক্তিশালী জালিমদের কাছ থেকে গ্রহণ করার বিষয়টির সাথে সাদৃশ্য রাখে। বনু জুরহুমের যেসব লোক এ কাজে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সকলেরই নাম ছিল ফজল। তাদের প্রতি লক্ষ করেই নাম রাখা হয়েছে-হিলফুল ফুজুল।[20]

নবী হবার পর রাসুল (সাঃ) এর ইনসাফের মিশন আরো ব্যাপকভাবে শুরু হয় তার কিছু উদাহরণ দেয়া হলো,

হাতেব বিন আবি বাতলা ছিলেন একজন বদরি সাহাবি। অল্প সংখ্যক সাহাবির মতো তিনি নবীজির গোপন কার্যক্রম সম্পর্ক জানতেন । একবার নবীজির মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতির বিষয়ে মক্কাবাসীকে গোপনে চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা করে যা, জিবরাঈল (আঃ) নবীজিকে জানিয়ে দেন। নবীজির কাছে তিনি সত্য স্বীকার করে বলেন, মক্কার মুশরিকদের কাছে তার পরিবার

[20] তাজুল উরুস, জুবাইদি রচিত, খণ্ড: ৩০, পৃষ্ঠা: ১৭৯; লিসানুল আরব, ইবনু মানজুর, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৫২৪।

আছে তাই তিনি ভেবেছেন তাদের নবীজির মক্কা আক্রমণের কথা আগে জানালে কুরাইশরা তার পরিবার কে রক্ষা করবে । ঘটনার সত্যতা যাচাই করে নবীজি তাকে ক্ষমা করে দেন যদিও আল্লাহ রাসুলের গোপন বিষয় প্রকাশের অপরাধ করেছেন।

মক্কা বিজয়ের সময়ে বনু মাখযুম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত নারী একটি স্বর্ণালংকার চুরি করে।কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তার হাত কাটার আদেশ দিলেন নবীজি । সম্ভ্রান্ত গোত্রের মহিলা বলে সবাই বিচলিত বোধ করল। নবী (সা.)-এর প্রিয় পাত্র উসামা বিন জায়েদকে গিয়ে সবাই রাজি করালো যে, তুমি গিয়ে একটু সুপারিশ করো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন ও বললেন, 'আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে সুপারিশ করছ? তারপর দাঁড়িয়ে সবার উদ্দেশে বক্তৃতা দিলেন এবং রাজা-প্রজাসহ সমাজের প্রত্যেক সদস্যের মাঝে সমতার ঘোষণা দিয়ে ইসলামের মানহাজ ও সুবিচার ব্যাখ্যা করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ إِلَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

হে জনমণ্ডলী, জেনে রাখো, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা এই আচরণের কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত লোক চুরি করত, তাকে তারা ছেড়ে দিত আর যখন তাদের মধ্যে কোনো অসহায় দুর্বল লোক চুরি করত, তারা তার ওপর দণ্ড প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তাহলে নিশ্চয় আমি তার হাত কেটে দিতাম। [21]

কি সুন্দর ইনসাফের প্রয়োগ ! কিন্তু , আমাদের আধুনিক সমাজে ছোট ছোট চুরি করলেও একজন গরিব মানুষকে মেরে হাড় পর্যন্ত ভেঙে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, সমাজের রাঘব বোয়ালরা সামাজিক উন্নয়ন ও রাষ্ট্রীয় খাত থেকে লুটপাট করে , ধরা খেয়েও তারা জেলেও বাইরে আনন্দে দিন কাঁটায়। বাস্তবতা হলো , ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতিই এর অন্যতম কারণ।

ইমাম আহমাদ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহ খাইবারকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য গনিমত হিসেবে দিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদেরকে ওখানেই থাকার অনুমতি দিলেন এবং খাইবারের সম্পদ তার ও তাদের মধ্যে বণ্টিত হবে বলে স্থির করে দিলেন। (ফলের মৌসুম

[21] (সহীহ বুখারি হাদিস নং ৩২৮৮, মুসলিম: হাদিস নং ১৬৮৮)

এলে) তিনি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.-কে পাঠালেন। তিনি ইহুদিদের জন্য খাইবারের খেজুরবাগানের ফলের পরিমাণ অনুমান করলেন। (তারপর তাদের বললেন, হে ইহুদি সম্প্রদায়, তোমরা আমার কাছে সৃষ্টিজগতের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত, তোমরা আল্লাহ তাআলার নবীদের হত্যা করেছ এবং আল্লাহর ওপর মিথ্যাচার করেছ। কিন্তু তোমাদের প্রতি আমার ঘৃণা তোমাদের প্রতি সামান্য অবিচার করতে আমাকে প্ররোচিত করছে না। আমি খেজুরের পরিমাণ বিশ হাজার ওয়াস্ক অনুমান করেছি। তোমরা যদি চাও তা নিতে পারো। আর নিতে না চাইলে আমি নেব। ইহুদিরা বলল, এই সুবিচারের দ্বারা আকাশসমূহ ও জমিন টিকে আছে। আমরা তা গ্রহণ করলাম। [22]

আবুল আস বিন রবি ছিলেন নবিজীর জামাতা যয়নব রা এর স্বামী। মক্কা বিজয়ের কয়েকদিন আগে পথের মধ্য মুসলিমরা কুরাইশদের মাল ছিনিয়ে নেয়া কিন্তু, আবুল আস পালিয়ে যান । এরপরে , সেই মাল ফেরত পেতে আবুল আস যয়নব রা ঃ এর ঘরে আসেন এবং তিনি তাকে আশ্রয় দেন। যখন যয়নব রা ঘোষনা দেন যে, তিনি তাকে আশ্রয় দিয়েছেন তখন নবীজি সাঃ প্রথমবার সাহাবীদের সাথে বিষয়টি জানতে পারে এবং বলেন , সামান্য থেকে সামান্যতম মুসলমানও কাউকে আশ্রয় দিতে পারে। নবীজি তার মাল যারা ছিনিয়ে নিয়েছে তাদের ফেরত দিতে বলেন তাদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়ে। কিন্তু, সাহাবীরা নবীজির কথার গুরুত্ব দিলেন। নবীজি ইনসাফের সাথে বিষয়টি মূল্যায়ন করে। পরে আবুল আস কালেমা পরে মুসলমান হন।

এটি একটি আন্তর্জাতিক আইন যে , সকল শাসক দূতের জান ও মালের নিরাপত্তা দিবে । আবার , দু দেশের মধ্য যে চুক্তি হয় তা মানা ও আবশ্যক। মুসাইলামা কায্যাব ছিল মিথ্যা নবুয়াতের দাবিদার । একবার তার দুজন দূত নবীজি সা এর কাছে আসলেন যারা সেই ভন্ডনবীর ওপর ঈমান এনেছিল। ইসলামি শরিয়াত অনুসারে , যারা মিথ্যা নবী দাবিদারের ওপর ঈমান আনে তাদের হত্যা করা হয় । কিন্তু নবীজি এখানে ইনসাফ করেছেন যদি তাদের হত্যা করার ক্ষমতা তার ছিল । মহানবী সা বললেন,'' আল্লাহর শপথ ! ,দূত হত্যা করার নিয়ম যদি বাধা না হত , তাহলে আমি তোমদের দুজনকে হত্যা করতাম''। [23]

সফিয়্যা বিনতে শায়বা বর্ণনা করেন-

রাসুল [মক্কা বিজয়ের সময়] যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন [তখন মক্কা বিজয় হয়ে গেছে, আর মক্কার লোকদের মন থেকে ভয় ও আতঙ্ক দূর হয়ে গেল, তখন রাসুল বাইতুল্লাহ শরিফে আগমন করলেন। উটের ওপর সওয়ার থেকেই কা'বার তাওয়াফ করলেন। তাওয়াফ শেষ

[22] (আহমাদ, হাদিস নং ১৪৯৯৬; ইবনে হিব্বান, যাদিস নং ৫১৯৯; শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ)

[23] আবু দাউদ হাদিস ২৭৬১

করে তিনি উসমান বিন তালহাকে ডেকে পাঠালেন, [যিনি কা'বার দেখভাল করতেন।] এবং তার থেকে চাবি চাইলেন।

ইরশাদ হল- 'উসমান বিন তালহা কোথায়?'

ইনি হুদাইবিয়ার সময় মুসলমান হয়েছিলেন। তাকে বললেন, বাইতুল্লাহর চাবি নিয়ে এসো। তিনি বাড়ি গিয়ে তার মায়ের নিকট চাবি চাইলেন। তার মা দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি তার মাকে ধমক দিয়ে বললেন-

'তোমাকে চাবি দিতেই হবে। নচেৎ তলোয়ার বের করতে আমি বাধ্য হব।'

তার মা তাকে চাবি দিলেন। চাবি এনে তিনি নবীজিকে দিলেন।

উসমান বিন তালহার চাবি দেওয়ার পর বাইতুল্লাহর দরজা খোলা হল। রাসুল কা'বাঘরের ভেতর প্রবেশ করলেন। দেখতে পেলেন, কাঠের বানানো একটি কবুতর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। সেটা হাতে নিয়ে ভেঙ্গে মাটিতে ফেলে দিলেন।এরপর তিনি কা'বাঘরের দরজায় দাঁড়ালেন। মাথা নত করে মক্কাবাসীরা তার অপেক্ষা করছিল সেখানে -না জানি আজ তিনি কী ফয়সালা করেন! তিনি সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। তখন আলী দাঁড়িয়ে সবিনয় আরজ করলেন-

'হে আল্লাহর রাসুল! হাজিদের পানি পান করানোর যে সৌভাগ্য আমাদের আছে, তার সাথে বাইতুল্লাহর দেখভালের দায়িত্বও আমাদের আছে, তার সাথে বাহতুল্লাহর দেখভালের দায়িত্বও আমাদের ওপর অর্পণ হোক। [আর চাবি আমাদের হাতে দিন, যেন এই সম্মানও আমাদের হয়।] আল্লাহ আপনাকে আরও বরকত ও রহমত দান করুন।'

এই ক্ষেত্রেও রাসুল পূর্ণ ন্যায় ও ইনসাফের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। যেহেতু অনেক বছর থেকেই এই দায়িত্ব আদায় করে আসছেন উসমান বিন তালহা, তাই চাবি দেওয়ার জন্য তাকেই খোঁজ করলেন।

আল্লাহর রাসুল আজ যাকে ইচ্ছা, চাবি দিতে পারেন।মক্কীজীবনে একবার রাসুল ও চাবি চেয়েছিলেন, কিন্তু তাকে চাবি দিতে এই উসমান বিন তালহা অস্বীকার করেছিলেন। কথাটা তার ভালভাবেই স্মরণ ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি ইরশাদ করলেন-

'উসমান! এসো। তোমার চাবি নাও। আজকের দিন বিশ্বাস রক্ষার ও অনুগ্রহের দিন। [24]

ইংরেজ প্রাচ্যবিদ মনটেগোমারি ওয়াট বলেন,

আমি আশা করি, মুহাম্মদের জীবন সম্পর্কে এ অধ্যয়ন সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের ব্যাপারে নতুনভাবে গুরুত্বারোপে সহায়ক হবে। ...তাঁর সফলতার পাশাপাশি স্বীয় মতবিশ্বাসের পথে নিপীড়ন সহ্য করা, তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ও অনুগামী যারা তাঁকে নিজেদের নেতা হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন, তাদের প্রতি সমুন্নত আচরণ-এ সবকিছু তাঁর ব্যক্তিত্বের মাঝে প্রোথিত ইনসাফ ও নিষ্কলুষতার প্রমাণ বহন করে।[25]

ফরাসি প্রাচ্যবিদ গোস্তাভ লি বোন

মুহাম্মদ অত্যন্ত ধৈর্য ও উদারচিত্তে নানা প্রকার নিপীড়ন ও নির্যাতন মোকাবিলা করেন। [26]

... যে কুরাইশরা দীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ তাঁর সাথে শত্রুতা করেছে, তাদের সাথেও তিনি অত্যন্ত নম্র ও সহনশীল আচরণ করেছেন। [27]

আমিরুল মুমিনিন উমর (রাঃ) এর ঘটনা ঃ

ইসলামের ২য় খলিফা উমর (রাঃ) মসিজিদে নববীতে বসা অবস্থায় পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিলেন। তিনি অভিযোগ করে বসলেন," শাসক নিয়োগ দেয়া সময় আপনি তো তাদের শর্ত মানিয়ে নেন; কিন্তু পরে আর হিসাব নেন না যে , শর্তগুলো তারা পালন করল কিনা। মিশরে আপনার নিয়োগক্রত শাসক আপনার আরোপিত শরগুলো না মেনে নিষিদ্ধ কাজগুলো করছে। খলিফা বিষ্যটি সাথে সাথে আমলে নিয়ে মিশরে সুজন আনসারি সাহাবীকে পাঠালেন অভিযোগের স্ত্যতা যাবাই করতে এওবং বললেন দায়িত্ব পালনে সত্যি সে ক্রুটি করতে তাতক্ষনাত তাকে ধরে আনতে। অভিযোগ সত্য অরমানিত হওয়ায় তাকে আর আগের পদে ফিরিয়ে সেয়া হলো এবং ভয়, তাকওয়য়া ও একনিষ্ঠতার সাথে দায়িত্ব পাওন করতে লাগলেন।

আরেকটি ঘটনা যেখানে , খুনের আসামী গ্রাম্য ব্যক্তির জামানত এর প্রশ্ন উঠে। দুই পুত্র খিলফার কাছে এক অজানা লোকে ধরে আনে আমাদের বাবার হত্যার দায়ে। শাস্তি স্বরুপ

[24] আকযিয়াতু রাসুলিল্লাহি: ২/৬৬৮
[25] মুহাম্মদ ফি মক্কা, মনটেগোমারি ওয়াট, পৃষ্ঠা: ৫২ ও ৫২১ থেকে পরিমার্জিত
[26] হাদারাতুল আরব, গোস্তাভ লি বোন, পৃষ্ঠা: ১০৪-১০৫
[27] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১০৮

কিসাস নির্ধারণ করা হয় অর্থাৎ খুবের বদলা খুন। খিলফআ রকবার অও তার বংশ ,মর্যাদা, গোত্র কিছু জিজ্ঞেস করেন নি ।কারন এটি ইনসাফ যে , শাস্তি যে করুক হোক দনী বা দরিদ্র তাকে শাস্তি পেতেই হবে ।কিন্তু , গ্রাম্য লোকটি আবদার করে বসল যে , সে শেষবারের মত তার স্ত্রী সন্তানদের সাথে দেখা করে আসতে চায় তিনদিনের জন্য । কিন্তু, অপরিচিত হওয়ায় কে হবে তার জামানত? খিলফা নিজেও চিন্তিত হলেন। শেষে আবু যর গিফারি রাঃ জামানত হন। তিনদিন পর যখন ফিরে এলেন এখন সবাই অবাক হলেন। তখন সেই বাদী দুই পুত্রকে উমর রা এখন কি করবে বলে সুযোগ দিলেন। তারা আসামীর সততায় মুগ্ধ হয়ে ক্ষ০মা করে দিলেন । খলিফার দু চোখ ভরে পানি নেমে আসল এবং উচু আওয়াজে আল্লাহু আকবার বললেন।

উসমান (রাঃ) এর ঘটনা

উসমান রাঃ বসরার শাসককে একবার অপসারণ করেন ।আমিরুল মুমেনিন উসমান -র খেলাফতের চতুর্থ বছরের শুরুতেই কয়েকটি গোত্র তার আনুগত্য হতে সরে যায়। তাদের শায়েস্তা করার জন্য বসরার শাসক আবু মুসা আশআরি-কে দায়িত্ব দেওয়া হল। খলিফার নির্দেশে পুরো দেশে জিহাদের ফযিলত প্রচার করা হল।ইসলামি বাহিনী প্রস্তুত হলে আবু মুসা আশআরি চল্লিশটি খচ্চরের ওপর সফরের পাথেয় রাখলেন। নিজেও একটি ঘোড়ার ওপর সওয়ার হলেন। পদাতিক বাহিনী যখন তাকে ঘোড়ার ওপর দেখতে পেল, তারা তার ঘোড়ার লাগাম ধরল। বলল, আমাদেরকেও সওয়ারি দিন; নচেৎ আপনিও পায়ে হেঁটে আমাদের সাথে চলুন-যেমনটা পায়ে হেঁটে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আবু মুসা আশআরি তাদের শাসালেন এবং কয়েকজনকে কোড়ারও মারলেন। জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আবু মুসা আশআরি তাদের শাসালেন এবং কয়েকজনকে কোড়ারও মারলেন। উসমান-র নিকট ফরিয়াদ করা হল। তিনি পুরোপুরি অনুসন্ধান নিলেন। আবু মুসা -কে দোষী পেয়ে তার পদ থেকে তাকে অপসারণ করে দিলেন। [28]

আলী (রাঃ) এর ঘটনা

আলী (রা) এর একটি বর্ম হারিয়ে গিয়েছিল যা তিনি এক ইয়াহুদি এর নিকট দেখতে পান । কিন্তু , সেই ইয়াহুদি তা অস্বীকার করলে ফয়সালার জন্য মুসলিম কাজী শুরাইহ এর নিকট যান । আইন অনুসারে আলী (রাঃ) কে দুজন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা হয় । তখন তিনি তার গোলাম কুম্বুরকে পেশ করলেন এবং সে বলল ,ওই বর্মটি আলী (রাঃ) এর । ২য় সাক্ষী

[28] মুসলিম ইতিহাসের সোনালী বিচার , পৃ ২৭৯

হিসেবে আলী (রাঃ) এর পুত্র হাসান এ হুসাইনকে পেশ করলে তারাও একি সাক্ষ্য দিল । কিন্তু, পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় শুধু গোলামের সাক্ষ্য নিলেন কাজী। রায় দিলেন ইয়াহুদির পক্ষে । ইয়াহুদি খুব বিস্মিত হলেন এবং বললেন , মুসলমানদের আমির আমাকে মুসলিম কাজির নিকট নিয়ে এলেন ।কাজী সাহেব আমার পক্ষে রায় দিলেন । আমিরুল মুমিনিনও বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলেন। এরপর সে কালিমা পরে মুসলিম হলেন। এই ঘটনায় লক্ষণীয় বিষয় হলো, আলি (রা.) যদিও একজন খলিফা তবুও তিনি আইনের আশ্রয় নিয়ে নিজের নিয়োগকৃত বিচারকের দ্বারস্থ হয়েছেন। এরপর, খ্রিষ্টানের পক্ষে রায় দেওয়াও তিনি বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন কারন এখানে ইনসাফের বিষয় জড়িত । ইসলামের ন্যায়পরায়ণতার এমন দৃষ্টান্ত এখনকার সমাজে বিরল।

খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ

ইয়ামেনের একটি দূর প্রদেশ থেকে এক ব্যক্তি খলিফার কাছে আসেন । অনেক দূর থেকে অত্যাচারে শিকার ব্যক্তির কথা শুনে খলিফা সওয়ারি থেকে নিজে নামেন ও তার জুলুমের কথা শুনেন । লোকটির শস্য উৎপাদনের জমি থেকে অন্যায়ভাবে তাকে উৎখাত করে বেদখল করা হয়। সবশুনে খলিফা সাথে সাথে ন্যায্য বিচারের ব্যবস্থা করেন । যখন পরদেশি লোকটি চলে যাবে তখন তিনি তার যাতায়াত খরচ , পোশাক এর খরচ যা ব্যয় হয়েছে হিসাব করে ১৫ দিনার এরমত অর্থ দিয়ে দেন সাথে করে।

সুলতান সুলায়মান

উসমানি সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং সাহসী শাসক এর একজন ছিলেন সুলতান সুলায়মান। জনগণ কখনো তার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতা ও নিপীড়নের কোনো অভিযোগ তুলেনি।

তার শাসনকালের শুরুতেই তার এই ন্যায়বিচার ও ন্যায়ের শাসনে মুগ্ধ হয়ে জনগণ তাকে 'কানুনি' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি কেবল ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তার পিতার শাসনামলে যে সকল উজির জুলুম ও অন্যায় করেছিল তিনি তাদের শাস্তি দেন। মানুষকে জুলুম করার জন্য 'হুনি' (রক্তপাতকারী) হিসাবে পরিচিত নৌ-সেনাপতি জাফরকে ফাঁসি দেন। [29]

[29] বুরহান উদ্দিন, কানুনি সুলতান সুলায়মান , দৈনিক সংগ্রাম ৮ ডিসেম্বর , ২০১৮

কালজয়ী এ সুলতানের এক বিস্ময়কর ইনসাফের ঘটনা আছে ।

উসমানি সাম্রাজ্যের অধিপতি সুলতান সুলায়মান একবার খিলাফতের রাজধানী ইস্তাম্বুলে একটি সুবিশাল নয়নাভিরাম, গগনচুম্বী, চিত্তাকর্ষক একটি মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ নির্মাণ করেন। তার মনের ইচ্ছে ছিল, ইস্তাম্বুলের সবচেয়ে অভিজাত স্থানে হবে সেই স্বপনের মসজিদ । অনেক খোজার পর যে জায়গাটি পাওয়া গেল সেখানে এক ইহুদির কুড়েঘর ছিল যা সে কখনও বিক্রি করবে না ও ছেড়ে যাবে না বলে দিল । কোনভাবে তাকে রাজি করানো গেল না আর ইসলামি আইন অনুযায়ী এ জমি বিক্রিতে তাকে জোর করাও যাবে না । সুলতানও চাচ্ছেন না কারো ওপর জুলুম হোক। শেষে সুলতান নিজে গেলেন সেই ইহুদির দরজায় তাকে অনুরোধ করার জন্য । সুলতানকে দেখেই ও তার কথা বিনয়ি শুনে ইহুদি রাজি হয়ে গেল ।

অল্প কদিনের মধ্যে কিনে নেওয়া হলো ইহুদির ভাঙা ঘর এবং তার জমি। চমৎকার অবস্থানে পুরো জায়গায় মসজিদ তৈরিতে কোনো বাধা-বিপত্তি থাকল না আর। ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মাণকাজ শুরু হয়ে প্রায় আট বছর ধরে চলে নির্মাণযজ্ঞ। ১৫৫৭খ্রিষ্টাব্দে এর উদ্বোধন করা হয়। জামে সুলায়মান নামে আজও এই মসজিদ প্রতিদিন হাজারো পর্যটককে মুগ্ধ করে। মসজিদটি নির্মাণে সুলতান সুলায়মানের ব্যবহার ইসলামের মহানুভবতা ও ন্যায়পরায়ণতার এক নজিরবিহীন দলিল হয়ে থাকবে। [30]

অসামান্য ন্যায়পরায়ণতায় মুগ্ধ হয়েই খ্রিষ্টান নেতা মার্টিন লুথার তার ঐতিহাসিক সেই মনোবাসনার বহিঃপ্রকাশ করেছিলেন এভাবে, 'হে প্রভু, শীঘ্রই আমাদের মাঝে তুর্কিদের মতো শাসক পাঠাও, যাতে আমরা তোমার ঐশী ন্যায়পরায়ণতার অংশ লাও করতে পারি।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'যে তুর্কিরা সারা দুনিয়ায় ন্যায়পরায়ণতা ছড়িয়ে দিচ্ছে, সেই তুর্কিদের বিরোধিতা করা অবৈধ।‘ [31]

সালাউদ্দীন আইয়ুবী

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি (রহঃ) ছিলেন ইসলামিক রাষ্ট্রের সেই মহান বীর যিনি ১১৮৭ সালে (৫৮৩ হিজরি) মুসলমানদের প্রথম কেবলা ঐতিহাসিক ‘বায়তুল মুকাদ্দাস’ জয় করেন। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বেই খ্রিস্টান ক্রুসেডার হাত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস মুক্ত হয়েছিল। ইতিহাস

---

[30] উরখান মুহাম্মাদ আলি, রাওয়াইয় মিনাত তারিখিল উসমানি: ৮৪।

[31] আব্দুল করিম ইজ্জুদ্দিন , খাওয়াতিরু উসমানিয়্যাহ ঃ ৮৭ অবলম্বনে , উসমানি খেলাফতের স্বরনকণিকা ঃ ১০১

আজও তাকে তার বীরত্বের জন্য স্মরণ করে । আজও মাজলুম ফিলিস্তিনীরা একজন সালাউদ্দীন আইয়ুবীর প্রতিক্ষায় দিন গুনে ।

আল-কাযী বাহাউদ্দীন বলেন:

"তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু ও গরীবের বন্ধু। কাযি, বিচারক ও আলিমদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কাউন্সিলে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার তিনি সমাজের সবরকম মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতেন। যুবক-বৃদ্ধ, ধনী-গরীব সবার। ঘরে থাকুন বা সফরে, এই কাজ থেকে তাঁর মুক্তি ছিলো না। তিনি বাদীর অভিযোগ শুনে যত্ন নিয়ে তা সমাধা করতেন।"

তিনি আদালতে নিঃসংকোচে-নিরহংকারে তাঁর প্রতিপক্ষের সাথে পাশাপাশি দাঁড়াতেন, যাতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। 'উমার আল-খাল্লাতি নামে এক ব্যবসায়ী ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে তার দাস সুন্কুর ও তার সম্পদ অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ আনে। বিচারক ইবনু শাদ্দাদের সামনে সে তার সাক্ষী নিয়ে আসে। সালালহউদ্দীন শান্ত থাকেন। তিনিও তাঁর সাক্ষী নিয়ে আসেন। উভয়পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়। শেষে দেখা গেলো যে, ব্যবসায়ী সালাহউদ্দীনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছিলো। কিন্তু মামলা জেতার পর সালাহউদ্দীন সেই ব্যবসায়ীকে কিছু মাল-সম্পদ উপহারস্বরূপ দিয়ে তাঁর দয়াশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

তিনি প্রজাদের অনেক যত্ন নিতেন এবং তাদের উপর চাপানো কিছু কর ও দায়িত্ব মওকুফ করে দেন। ইবনু জুবাইর উল্লেখ করেন যে, প্রজাদের জন্য সালাহউদ্দীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলোর মধ্যে আছে বিক্রয় কর মওকুফ করা এবং নীলনদ থেকে পানি পানের উপর আরোপিত কিছু বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা।

মক্কা-মদীনার পুনঃনির্মাণ ও সেখানকার লোকেদের সাহায্য করার জন্য হিজাযগামী হাজ্জযাত্রীদের প্রত্যেকের উপর সাড়ে সাত দিরহাম কর আরোপ করা ছিলো। ফাতিমিরা এই কর আদায় করতে অনেক কঠোরতা অবলম্বন করতেন। যারা তা পরিশোধে ব্যর্থ হতো তারা চরম শাস্তি পেতো। সালাহউদ্দীন গরীব হাজীদের উপর থেকে এই কর প্রত্যাহার করে নেন এবং হিজাযবাসীদেরকে এর সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে দেন। এভাবেই সালাহউদ্দীনের ন্যায়পরায়ণ শাসনাধীনে হাজীগণ অনেক কষ্ট থেকে রক্ষা পান। [32]

[32] শাইখ আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান (রহ.) , মুসলিম ইতিহাসের মহাবীর ও জেরুজালেম জয়ের নায়ক সুলতান সালাউদ্দীন আইয়ুবী (৫৩২-৫৮৯ হিজরী) , পৃ ১২৬-১২৭

ন্যায়বিচারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামে হক দুই ধরনের । এক , আল্লাহর হক ও দুই, বান্দার হক । আমাদের এ দুই ধরনের হক আদায়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। কোন হক নষ্ট হলে হাশরের মাঠে তার জবাবদিহিতা করতে হবে । তবে, আল্লাহ চাইলে বান্দার খাস দোয়ায় ও তওবায় আল্লাহর হক নষ্ট করার জন্য ক্ষমা করতে পারেন । কিন্তু , একজন মাজলুম যতক্ষণ না জুলুমকারীকে ক্ষমা করবে ততক্ষণ আল্লাহ সেই জুলুমকারীকে ক্ষমা করবেন না । এজন্য , অন্য অধিকারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে । ন্যায়বিচার এর মূলনীতি , পরিসীমা এজন্য জানা অতীব জরুরি।

পার্থিব জীবনের সর্বত্র ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। কেননা আদল ছাড়া ব্যক্তিগত জীবন হতে জাতীয়, আন্তর্জাতিক কোন জীবনই শান্তি-শৃংঙ্খলা, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিরা পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কর্ম জীবন ও পেশাগত জীবন নির্বাহ করে। কাজেই কারো প্রতি যাতে জুলুম না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর একমাত্র আল্লাহর বিধানই মানুষের সমাজ জীবনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

দেশের শাসন ব্যবস্থা যদি ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়, তবে জাতীয় জীবনে অশান্তি, বিশৃংঙ্খলা, নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। কোনো একটি সমাজ বা রাষ্ট্রে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার কায়েম করার জন্য জনগণ ও রাষ্ট্র উভয়ের ভূমিকা জরুরি । দেশের নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া রাষ্ট্রের পক্ষেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

আদল বা ন্যায়বিচারের বিপরীত হল যুলুম। যা ইনসাফের খেলাফ। যার যা প্রাপ্য তাকে তা না দেয়া হলো যুলুম। একে অবিচারও বলা হয়। অবিচার হল বড় যুলুম। অবিচারের মাধ্যমে নিরপরাধ ব্যক্তিগণ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এটা কোন সভ্য সমাজের বৈশিষ্ট হতে পারে না। ইসলাম ন্যায়বিচারের প্রতি যতটা আদেশ দিয়েছে এবং এর প্রতি উৎসাহ দিয়েছে, তারচেয়ে অনেক কঠিনভাবে জুলুমকে নিষেধ করেছে এবং চরমভাবে ইসলাম জুলুমের বিরোধিতা করেছে। চাই জুলুম নিজের সাথে হোক বা অন্যের সাথে। বিশেষত শক্তিশালীরা জুলুম করে থাকে দুর্বলদের উপর। ধনীরা জুলুম করে গরীবদের উপর। শাসকরা জুলুম করে জনগণের উপর। সবার সাথে সবধরণের জুলুমই হারাম করে দিয়েছে ইসলাম। যে যত দুর্বল, তার সাথে জুলুম করলে গুনাহও ততো প্রবল। [33]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদল ও ইনসাফ এরূপ ছিল যে, সত্য-মিথ্যা অনুধাবন করেও তিনি এক ইহুদী ও মুসলমানের মধ্যকার আহুত সমস্যা সমাধানে ইহুদীর পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন।ফলে মানব জাতির ইতিহাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

[33] মালামিহুল মুজতামাইল মুসলিম: ১৩৫

আদল ও ইনসাফ বা সুবিচার প্রতিষ্ঠার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ পাওয়া যায়, যা তাঁর কর্মময় জীবনের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত। ন্যায়বিচার শুধু আদালতের ক্ষেত্রেই নয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজে এর প্রতিফলন ঘটাতে হবে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল স্তরে।

আজকাল অনেককে ব্যক্তি ও পরিবারে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার কায়েম না করলেও রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য খুব তৎপর। প্রকৃতপক্ষে এটাও একটি বেইনসাফি ও অবিচার। যেমন; অনেকেই আমরা নিজ স্ত্রী, সন্তান-সন্তুতি, ভাই-বোন, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুবিচার করি না। স্ত্রীকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছি, ছেলে-মেয়েদের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় বা দানের ক্ষেত্রে কম-বেশী করছি, বোনদেরকে মীরাছ বন্টনের সময় ঠকাচ্ছি, পিতা-মাতার হক্ব হচ্ছে সব চেয়ে বেশী, তাদের সাথেও অবিচার করতে পিছ পা হচ্ছি না, তাই যদি না হবে তাহলে কোন সভ্য সমাজের লোক কি নিজ পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে কখনও রেখে আসতে পারে? এটা তো শুধু অবিচার নয়, এটা অমানবিক এবং মনুষ্যত্বকেও হার মানায়। আর এ কারণেই আজকের সমাজ ব্যবস্থায় ইনসাফ ও ন্যায়বিচার দারুনভাবে উপেক্ষিত। কারণ এর গোড়া পত্তন করতে হবে ব্যক্তি ও পরিবার থেকে। তাহলেই তার প্রতিফলন বা সুফল আমরা পাব। [34]

পৃথিবীতে মানুষের সাথে মানুষের চলতে হলে সবার অধিকারের কথা চিন্তা করা উচিত। সমাজে মানুষের হোক মুসলিম কি অমুসলিম সবার সম্মিলিত জীবন যেন সুশৃঙ্খল ও গতিময় হয়,সেজন্যই মহান আল্লাহ কুরআন ও হাদিসে ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামে রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা যা মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন সর্বত্র যেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পায় তার প্রতিফল পরিলক্ষিত হয়।

এটি কোন ঐচ্ছিক বিষয় না বরং অত্যাবশ্যকীয় আদেশ যা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন সুরা নিসার ৫৮ নং আয়াতে ‘’ আদল” শব্দের পাশাপাশি “আমর” দিয়ে বুঝিয়েছেন। শরীয়াতের বিধান প্রতিষ্ঠিত করার এক অত্যাবশ্যকীয় মাধ্যম এ আদল। এটা একজন মুমিনের অন্তরে বদ্ধমূল হতে হবে যে , যখন দুপক্ষের মাঝে ফয়সালা করা হবে সেখানে ন্যায়পরায়ণতা অবশ্যই থাকতে হবে।

যখন মানুষ আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে কোন কাজ করে তখন মানুষের ব্যক্তিজীবন , সমাজ ও রাষ্ট্র জীবন বাঁধার সম্মুখীন হয়, সেখানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এজন্য , আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠত করতে হবে। এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

[34] https://www.waytojannah.net/blog/2015/02/13/justice-in-islam/

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

মানুষের স্বহস্ত উপার্জনের দরুন জল-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, ফলে তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করানো হবে, যাতে তারা বিরত হয়। সুরা রুম ,আয়াত ৪১

ন্যায়বিচারের ক্ষেত্র

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ হচ্ছে ইনসাফ। প্রকৃতপক্ষে , ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।এ ব্যবস্থায় এমন কোনো দিক নেই, যেখানে ন্যায়পরায়ণতার প্রয়োগ নেই। একজন মানুষকে ব্যক্তিজীবন থেকে নিয়ে তার পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ তার ছোঁয়া থাকবেই এটাই ইসলামের সৌন্দর্য্য ও নির্ধারিত মূলনীতি।আমরা জেনেছি যে , ইসলামে দুটি হক বা অধিকারের ওপর জোর দেয়া হয় । একটি হলো আল্লাহর হক অপরটি বান্দার হক। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রজুড়ে এই দুই হকের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন

মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন মানেই অনেগুলো সম্পর্কের সেতু বন্ধন । মা-বাবা , ভাই-বোন , পিতা-পুত্র , মাতা-কন্যা , দাদা-দাদি , নানা-নানী ও অন্যান্য যা রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে উঠে । একই ছাদের নিচে বসবাস করলেও সবাই এক আল্লাহর বান্দা। এখানে প্রত্যকের হক প্রত্যককে আদায় করতে হবে অন্যথায় , আল্লাহর কাছে বিচার দিবসে কঠিন জবাবদিহিতার সম্মুখীণ হতে হবে। পারিবারিক জীবনে যদি ইনছাফ এর ছিটেফোঁটা না থাকে, তাহলে সেখানে অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে। ইসলামের নির্দেশ হলো, সবার আগে নিজের সাথে ন্যায়বিচারের আদেশ দিয়েছেন।মুসলমানরা যদি নিজের হক, তার রবের হক এবং অন্যদের হকের মাঝে ভারসাম্যতা রক্ষা করে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে দ্রুত। আমাদের তাই কুরআনের নির্দেশ মেনে চলতে হবে যা নিষেধ করা হয়েছে তা করা থেকে বিরত থাকবো। আল্লাহ বলেন,

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

আপনি বলুনঃ এস, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে

অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই, নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ। সুরা আনআম আয়াত ১৫১

সন্তানদের ব্যাপারে ইনসাফ কায়েম করা:

ইসলামের একটি নিয়ম হলো, সন্তানদের সবাইকে বিশেষ কোনো উপহার সমান হারে দিতে হবে; আর না হলে কাউকে দেওয়া যাবে না। কিন্তু , আমাদের সমাজে এমন অনেক মাতা-পিতা আছেন, যারা এক সন্তানকে উপহার দিলে অন্যান্য সন্তানকে দেন না। এক্ষেত্রে, শরয়ী কারণ ব্যতীত এরূপ দান করলে তা হারাম বলে গণ্য হবে। শরীয় কারণ বলতে, সন্তানদের একজনের এমন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, যা অন্যদের নেই। যেমন, সে অসুস্থ কিংবা বেকার অথবা ছাত্র কিংবা সংসারে তার সদস্য সংখ্যা অনেক তথা সে পোষ্য ভারাক্রান্ত অথবা সে কুরআন মুখস্থ করেছে, তাই উৎসাহ ধরে রাখতে কিছু দেওয়া ইত্যাদি। পিতা এরূপ শরয়ী কারণবশত কোনো সন্তানকে কিছু দেওয়ার সময় নিয়ত করবে যে, অন্য কোনো সন্তানের যদি এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয়; তাহলে তাকেও তিনি তার প্রয়োজন মতো দেবেন। [35]

عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ أَعْطَانِيْ أَبِيْ عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّيْ أَعْطَيْتُ ابْنِيْ مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِيْ أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

আমির (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নুমান ইবনু বাশীর (রা.) কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি যে, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করেছিলেন। তখন (আমার মাতা) আমরা বিনতে রাওয়াহা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সাক্ষী রাখা ব্যতীত সম্মত নই। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমরা বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার পুত্রকে কিছু দান করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে সাক্ষী রাখার জন্য সে আমাকে বলেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি এ রকম করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[35] শাইখ সালেহ আল -মুনাজ্জিদ, যে হারামকে সবাই তুচ্ছ মনে করে, পৃ ৭৯

ওয়াসাল্লাম) বললেন, তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং আপন সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা কর।[36]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ

"তাহলে তুমি আমাকে সাক্ষী করো না। কেননা জুলুমের সাক্ষী আমি হতে পারি না।[37]

সন্তান-বিশেষকে অহেতুক অগ্রাধিকার দানের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করতে হবে। এর বিপরীত করলে সন্তানদের মধ্যে মন কষাকষির সৃষ্টি হয়, হিংসার জন্ম হয়, একে অপরের প্রতি শত্রু ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে উঠে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে , এক স্ত্রীর সন্তানকে যা দেওয়া হয়, অন্য স্ত্রীর সন্তানদের তা দেওয়া হয় না অথব্ তাদের একজনের সন্তানদেরকে বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয় বা বিশেষ উপহার দেয়া হয়, কিন্তু অন্যজনের সন্তানদের ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এসব ক্ষেত্রে বাস্তবে দেখা যায় ,ঐসব বঞ্চিত সন্তান ভবিষ্যতে তাদের পিতার- মাতার সঙ্গে সদাচরণ করে না। এজন্য ,সন্তানদের প্রতি কিছু দানের্র ক্ষেত্রে ইনসাফ করা বা সমতা রক্ষা করা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানদের মধ্যে দানের বিষয়ে কাউকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً

"তোমার সন্তানেরা তোমার সাথে সমান সদাচরণ করুক, তা কি তোমাকে আনন্দিত করবে না?[38]

হাদীসের প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন গ্রন্থ ‘মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক’ -এ ইমাম আবদুর রাযযাক ইবনে হাম্মাম (মৃত্যু : ১২৬ হি.-২১১ হি.) বর্ণনা করেন, জনৈক আনসারী সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকলেন। ইতিমধ্যে ঐ সাহাবীর এক পুত্র তার কাছে এল। তিনি তাকে চুমু খেয়ে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং কোলে বসালেন। কিছুক্ষণ পর তার এক কন্যাও সেখানে উপস্থিত হল। তিনি তার হাত ধরে নিজের কাছে বসালেন। এটি লক্ষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন-

[36] বুখারী ২৫৮৭
[37] সহীহ মুসলি১৬২৩

[38] সহীহ মুসলিম ১৬২৩ , সুনানে ইবনে মাকাজ ২৩৭৫ , সুনানে আবু দাউদ ৩৫৪২

ولو عدلت كان خيرا لك، قاربوا بين أبنائكم ولو في القبل .وفي رواية الطحاوي :فهلا عدلت بينهما؟

অর্থাৎ উভয় সন্তানের প্রতি তোমার আচরণ অভিন্ন হওয়া উচিত ছিল। তোমরা নিজেদের সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করো। এমনকি চুমু খাওয়ার ক্ষেত্রেও।[39]

ওয়ারিসদের প্রতি ইনসাফ

আমাদের সমাজে এমন অনেক ঘটনা দেখা যায় যে , অন্যায় অসীয়ত এর মাধ্যমে ওয়ারিসদের ঠকানো হয়। মানব রচিত বিচার ব্যবস্থা ও মানব রচিত আইনের মাধ্যমে উকিলের মাধ্যমে লিখিত অন্যায়ভাবে অসীয়ত কার্যকর করার আদেশ দেয়া হয় এবং তখন বাধ্য হয়ে উকিলও এ অন্যায়ে সায় দেয়। অসীয়তের মাধ্যমে নানাভাবে একজন ওয়ারিস ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যেমন, কোনো ওয়ারিসকে তার প্রাপ্য ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত করা অথবা একজন ওয়ারিসকে ফারায়েজ এর মাধ্যমে যেটুকু দিতে হবে তার বিপরীতে তার জন্য অসীয়ত করা আবার , এক তৃতীয়াংশের বেশি অসীয়ত করা হয় অনেক্ষেত্রে ।বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা চালু না থাকায় একজন পাওনাদার অনেক ক্ষেত্রেই মানব রচিত বিধানের কারণে তার শরীয়ত প্রদত্ত অধিকার লাভে সমর্থ হয় না।

এতিমদের সম্পদ আত্মসাৎ এর ব্যাপারে আল্লাহ বিশেষভাবে কুরআনে বলেছেন ,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

যারা এতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্ত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে। সুরা আন নিসা আয়াত ১০

একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে ইনসাফ

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

তোমরা যতই সাগ্রহে চেষ্টা কর না কেন, স্ত্রীদের মাঝে তোমরা কখনই ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখতে পারবে না। তবে তোমরা কোন এক জনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না এবং অপরকে ঝোলানো অবস্থায় ছেড়ে দিও না। আর যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর ও সংযমী হও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা আন-নিসা ১২৯

ভালোবাসা হল অন্তরের কাজ যা কারো আয়ত্তাধীন নয়, বরং তা আল্লাহ প্রদত্ত বিষয়। এক্ষেত্রে কারো প্রতি অন্তরের ভালোবাসা প্রবল হতে পারে । যেমন , নবী করীম (সাঃ)-এরও তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা)র প্রতি সব চেয়ে বেশী ভালোবাসা ছিল। মানুষের আন্তরিক এই ভালোবাসা যদি বাহ্যিক অধিকারসমূহে সমতা বজায় রাখার পথে বাধা না হয়,

[39] মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৯/১০০

তাহলে তা জুলুম হবে না। কিন্তু অধিকাংশ লোক এক্ষেত্রে ভারসাম্য রাখতে পারেনা একজনের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসার কারণে অন্যদের অধিকারসমূহ আদায়ের টালবাহানা করে ব্যাপারে ত্রুটি করে এবং দোদুল্যমান অবস্থায় রাখে অর্থাৎ, তাদেরকে তালাকও দেয় না আবার, আর অধিকারসমূহ আদায় করে। আনা ঠিক করে যা অতি বড় যুলুম।

এজন্য ,একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সকলের সাথে ন্যায় ও ইনছাফপূর্ণ আচরণ করা স্বামীর জন্য অত্যন্ত জরুরি । তা না হলে পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এখানে নবীজি (সাঃ) বলেন,

إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ- ‘যে ব্যক্তির নিকট দুজন স্ত্রী আছে সে যদি তাদের মধ্যে সমতা না রাখে তবে ক্বিয়ামতের দিন সে তার দেহের এক পার্শ্ব পতিত অবস্থায় আগমন করবে’ ।[40]

এখানে বুঝাচ্ছে যে , যে ব্যক্তির কাছে দু'জন স্ত্রী আছে, সে যদি কোন একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে (অর্থাৎ, অপরজনকে একেবারে ত্যাগ করে রাখে), তাহলে সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার দেহের অর্ধাংশ ঝুঁকে থাকবে। তাহলে , শুধু একের অধিক বিয়ে করলেই হবে না , অন্তরে ইনসাফের বীজ বপোণ করতে হবে তা না হলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচা যাবে না।

আবুদ দারদা রা. তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে ধারাবাহিকভাবে রোযা ও কিয়ামুল লাইলে (রাত জেগে ইবাদত) মশগুল থেকে তার হক ক্ষুণ্ণ করতে চাইলে সালমান আল-ফারসি রা. তাকে বললেন(যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনে সত্যায়ন করেন) ,

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার প্রতিপালকের হক রয়েছে, তোমার ওপর তোমার নিজেরও (শরীরেরও) হক রয়েছে, তোমার ওপর তোমার পরিবারেরও হক রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেককে তার প্রাপ্য হক দাও।[41]

এছাড়া ,ইসলাম ন্যায়বিচারকে এতই গুরুত্ব দেয় যে কথার ক্ষেত্রেও ইনসাফ রক্ষা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ।আল্লাহ তাআলা বলেন,

(وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى

যখন তোমরা কথা বলবে ন্যায্য বলবে, স্বজনদের সম্পর্কে হলেও। (সুরা আনআম: আয়াত ১৫২)

[40] তিরমিযী হা/১১৪১; ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৯; মিশকাত হা/৩২৩৬, সনদ ছহীহ।
[41] (বুখারি, হাদিস নং ১৮৩২। তিরমিযি, হাদিস নং ২৪১৩)

পরিবারের প্রত্যেকে যদি অন্যের হক ঠিকমত আদায় করে, যেমন ঃ পিতা-মাতা সন্তানের হক , স্বামী স্ত্রী এর হক ইত্যাদি, তাহলে সে পরিবার সুখ ও শান্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

সামাজিক ক্ষেত্র

নিজের হককের সাথে অবশ্যই রবের হক ও অন্য মানুষদের হকের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যেকে যদি বসবাসরত অন্যের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকে, সবল দুর্বলের ওপর চড়াও না হয়, ধনী দরিদ্রের অধিকার আদায়ে সচেতন হয় তাহলে সেই সমাজ ও রাষ্ট্র শান্তিময় সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

অপরাধীর শাস্তির বিধান

অপরাধ করলে শাস্তি পেতেই হবে এটা সেই প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে । অপরাধী যখন তার অপরাধের কারণে অন্য মানুষের কষ্ট বা ক্ষতি করে, তখন সে সৃষ্টি জীবের যেমন অন্যায় করল এবং অপরদিকে স্রষ্টারও নাফরমানী করল। তখন ,এ জাতীয় অপরাধে 'আল্লাহর হক' ও 'বান্দাহর হক' উভয়টিই ক্ষুণ্ণ হয় এবং দোষী ব্যক্তি উভয়ের কাছেই অপরাধী বলে বিবেচিত হয়।সমাজে যখন অপরাধের মাত্রা বেড়ে যায় তা মানব সভ্যতার জন্য হুমকি স্বরুপ এবং সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। সমাজে সংগঠিত অপরাধ এবং অপরাধ প্রবণতা থেকে মানুষকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে ইসলামে রেয়েছে সুনির্দিষ্ট কিছু দিক-নির্দেশনা যা ন্যায় বিচারের মাধ্যমে শাস্তির বিধান কার্যকর করার জন্য বিচারক ব্যবহার করবেন।

‘’ইসলামী শাস্তি আইনের মূল উদ্দেশ্য কাউকে শাস্তি দেয়া নয়; বরং অপরাধ সংঘটনের সুযোগকে বাধাগ্রস্ত করা। এ কারণেই মানব রচিত আইনে যেখানে অপরাধ সংঘটনের পরেই কেবল শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, সেক্ষেত্রে ইসলাম অপরাধ সংঘটনের পূর্বেই এর সকল উপায়-উপকরণ ও পন্থা রোধ করে দেয়ার প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ রূপ প্রতিবন্ধকতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও কেউ অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়লে তখন ইসলাম তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে । ইসলাম প্রত্যেক অপরাধ ও শাস্তির সাথে আল্লাহভীতি ও পরকালের চেতনা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যার কল্পনা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ ও গোনাহ থেকে পবিত্র করে দেয়। জনমনে আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের ভয় সৃষ্টি করা ছাড়া জগতের কোন আইন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীই অপরাধ দমনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। পৃথিবীতে সাধারণ আইনে অপরাধ সম্পর্কিত সব শাস্তিকেই 'দণ্ডবিধি' নামে অভিহিত করা

হয়। কিন্তু ইসলামী আইন এ রূপ নয়। ইসলামী অপরাধের শাস্তিকে হুদুদ, কিসাস ও তা'যীরাত- এ তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এ তিন প্রকারের শাস্তির বিধানসমূহে অনেক বিষয়েই পার্থক্য রয়েছে।

সুতরাং যারা নিজেদের পরিভাষার আলোকে প্রত্যেক অপরাধের শাস্তিকে দণ্ড বলে এবং ইসলামী আইনের পরিভাষাগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা ইসলামী আইনের বিধি-বিধানে অনেক বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়। দণ্ডগত শাস্তিকে অবস্থানুযায়ী লঘু থেকে লঘুতর, কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। কিন্তু হুদূদের বেলায় কারো সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা পরিবর্তন করার অধিকার নেই। স্থান ও কাল ভেদেও এতে কোন পার্থক্য হয় না এবং কোন শাসক ও বিচারক তা ক্ষমাও করতে পারে না।ইসলামী আইন বিশেষ কয়েকটি অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়নি; বরং বিচারকের অভিমতের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্য যে রূপ ও যতটুকু শাস্তি প্রয়োজন মনে করবেন, ততটুকুই দেবেন। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, এ পর্যায়ের অপরাধসমূহ বুঝি প্রকৃত অপরাধ নয়; বরং আসল কথা হল- দলীল-প্রমাণ সীমিত আর অপরাধ ও অপরাধমূলক ঘটনাবলীর তো শেষ নেই। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি যখন বিকৃত ও বিপথগামী হয়ে পড়ে, তখন তা নিত্য নতুন ও রকমারি অপরাধ উদ্ভাবন করে। ইসলামী শরী'আত এ অবস্থার বাস্তবতা ও গুরুত্ব স্বীকার করেছে।[42]

ইসলামের শাস্তি আইনের ন্যায়বিচার ইসলামি শারিয়াহর একটি গভীর এবং ভারসাম্যপূর্ণ দিক। ইসলামি শাস্তি আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো হলো ঃ অপরাধ থেকে সমাজকে রক্ষা করা,অপরাধীর সংশোধন ,অন্যদের জন্য শিক্ষা ও সতর্কতা ,ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ন্যায্যতা দেওয়া।

আল্লাহ কোরআনে বলেন,

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

এবং হে বুদ্ধিমানেরা! কিসাসের ভেতর তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন (রক্ষার ব্যবস্থা)। আশা করা যায় তোমরা (এর বিরুদ্ধাচরণ) পরিহার করবে । (সূরা আল-বাকারা, ২:১৭৯)

তারমানে, ন্যায়বিচার ঠিকমতো প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে অপরাধ কমে, মানুষ নিরাপদ থাকে। আবার ,শাস্তি প্রয়োগের কঠোর প্রমাণ ছাড়া কাউকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয়, যা ন্যায়বিচারের

[42] ড. আহমদ আলী , ইসলামের শাস্তি আইন, পৃ ২৩,২৪

সুরক্ষা দেয়। ইসলাম এমনভাবে শাস্তির শর্ত নির্ধারণ করেছে, যেন তা **অন্যায়ভাবে প্রয়োগ না হয়**। উদাহরণস্বরূপ ,চুরি প্রমাণে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য, কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক নিরুপায়তা না থাকা ,ব্যভিচার এর ক্ষেত্রে ৪ জন বিশ্বস্ত সাক্ষীর উপস্থিতি বা স্বীকারোক্তি মিথ্যা অপবাদে ৪ জন সাক্ষী ব্যর্থ হলে অপবাদদাতার উপর ৮০ বেত্রাঘাত ।

হদ বলা হয় , যে সকল অপরাধের জন্য আল্লাহর অধিকার ক্ষুণ্ণ করার দরুন নির্ধারিত দন্ডের কথা কুরআন ও হাদীছে বলা হয়েছে । হদের বহুবচন হুদূদ। আর যে সকল অপরাধের বান্দার অধিকার ক্ষুণন করার দরুন কুরআন ও হাদীছে যে দন্ডের কথা বলা হয়েছে তা ক্বিছাছ ও দিয়াত নামে পরিচিত। হদ যেহেতু আল্লাহর হক তাই তা মওকুফ করা কিংবা হ্রাস-বৃদ্ধির কোন অধিকার মানুষের নেই তা সে যে পর্যায়েরই কেউ হোক না কেন। কিন্তু ক্বিছাছ যেহেতু বান্দার হক তাই তা মওকূফ করা কিংবা বাড়ান-কমানোর অধিকার বান্দার থাকে। হদ ও ক্বিছাছ ব্যতীত আদালত আর যেসব দন্ড বিধান করে থাকে তা তাযীর নামে পরিচিত।যে সকল অপরাধে হদ প্রযোজ্য তার সংখ্যা সাত। যথা: ১. চুরি, ২. ডাকাতি, ৩. ব্যভিচার, ৪. সতীত্বে দোষারোপ (অপবাদ), ৫. মদ পান, ৬. রিদ্দাহ বা দ্বীন ইসলাম ত্যাগ ও ৭. বিদ্রোহ।তবে ,মামলায় কোন সন্দেহ পেলে হদ কার্যকর হয় না। এজন্যে ওমর (রাঃ) বলেছেন, لَئِنْ أُعَطِّلَ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُقِيمَهَا بِالشُّبُهَاتِ ‘সন্দেহের কারণে আমি যদি হদ বাতিল করি তবে তা সন্দেহমূলে হদ কার্যকর করা থেকে আমার নিকট অধিক প্রিয়’ ।[43]

ইসলামের আইনে পক্ষপাতহীনতা এবং ন্যায়ের শুদ্ধতা গুরুত্বপূর্ণ । এছাড়া,ইসলামে শাস্তির পাশাপাশি ক্ষমা ও সংশোধনের পথও খোলা থাকে যেমন ঃ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি চাইলে কিসাস মাফ করে দিতে পারে, তাওবা করলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা যায়, বিচারকের বিচক্ষণতায় তাযীর শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় । নিরপেক্ষ বিচারক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মাধ্যমে শাস্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এতে, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার ঝুঁকি কমে ,মিথ্যা অভিযোগ রোধ হয় ,শাস্তি বৈধভাবে প্রয়োগ হয়। ইসলামের লক্ষ্য হলো এমন সমাজ তৈরি করা যেখানে অপরাধ কম হবে। তাই, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাকে শাস্তির আগেই প্রাধান্য দেয়।

অর্থব্যবস্থা

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার প্রায়োগিক কাঠামোর গোড়াপত্তন শুরু হয় মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে । সময় এর সাথে সাথে এটি পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে বিস্ত্রতি লাভ

[43] ইবনু আবি শায়বা, আল-মুছান্নাফ, হুদুদ অধ্যায় হা/২৮৪৯৩

করে। খোলাফায়ে রাশেদিনের সময়ে এসে আরো বেশি পরিণত হয়। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থার কাঠামোয় নাগরিক হিসেবে মুসলিম-অমুসলিম যারাই বসবাস করত সবার স্বাধীন বাণিজ্য অধিকার ছিল। কুরআন সুন্নাহর আলোকে যে সমাজে তখন গড়ে উঠে তাতে ন্যায় এর জয়ধ্বনি শোনা যায়। ইসলামে স্বণড়যুগের দিকে দ্রষ্টীপাত করলে দেখা যায় এখন , দান করার জন্য দরিদ্রকে খুজে পাওইয়া দুষ্কর যেমন , উমর (রাঃ) এর যুগে । ইসলামী অর্থনীতির কিছু মূলনীতি বা দার্শনিক ভিত্তি হলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। আল্লাহ বলেন ,

لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে আছে, সব আল্লাহরই। সুরা বাকারাহ , আয়াত ২৮৪

তাই , সকল সমপদের মালিক আল্লাহ আর আমাদের কাছে তা আমানত স্বরুপ। এ আমানতের খিয়ানত করা যাবে না ও অন্যর ওপর জুলুমও করা যাবে না। কেবল আল্লাহ যে পঅন্থা নিধারণ করেছেন সেই অনুযায়ী সম্পদে হস্তক্ষেপ করা যাবে। নিজেকে সম্পদের মালিক ভাবা যাবে না তবে মানুষ প্রাপ্ত সম্পদ থেকে উপকার গ্রহণের অধিকার রাখে মাত্র। আল্লাহ বলেন ,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক অধিকার রয়েছে ।সুরা আয যারিয়াত ১৯

সুরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ,কঠোরভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করতে নিষেধ করেছেন অথাত , এ ক্ষেত্রে ইনসাফ করতেই হবে ,জুলুম করা যাবে না।

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না। এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্নসাৎ করার উদ্দেশে শাসন কতৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না

আমাদের সমাজে দেখা যায় অনেক ব্যবসায়ী পণ্য মাপে ও ওজনে কম দিয়ে ক্রেতার সাথে বেইনসাফি কাজ করে । আল্লাহ এদের কথাও উল্লেখ করেছেন।

وَيٰقَوۡمِ اَوۡفُوا الۡمِكۡيَالَ وَالۡمِيۡزَانَ بِالۡقِسۡطِ وَلَا تَبۡخَسُوا النَّاسَ اَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡا فِى الۡاَرۡضِ مُفۡسِدِيۡنَ

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপো ও ওজন করো, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।" সূরা হুদ ,আয়াত ৮৫

فَاَوۡفُوا الۡكَیۡلَ وَالۡمِیۡزَانَ وَلَا تَبۡخَسُوا النَّاسَ اَشۡیَآءَہُمۡ وَلَا تُفۡسِدُوۡا فِی الۡاَرۡضِ بَعۡدَ اِصۡلَاحِہَا ؕ

'সুতরাং তোমরা পরিমাণে ও ওজনে পরিপূর্ণ দাও এবং মানুষকে তাদের পণ্যে কম দেবে না; আর তোমরা যমীনে ফাসাদ করবে না {সূরা আল-আ 'রাফ, আয়াত : ৮৫}

এছাড়াও, মিরাসের (মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ তার উত্তরাধিকারের মধ্য বন্টন) বিধান ইসলামি শরীয়াতের ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়সম্মত বিধান । ইসলামের এ বিধানের ফলে , পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয় এবং আত্নীয়স্বজনদের যার যার হক আদায় হয়। ইনসাফের প্রয়োগ এর ফলে পারিবারিকে কলহ হয় না যদি আল্লাহর বিধান যথাযথ আদায় হয়।
ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যে বিষয়গুলো ভূমিকা রাখে তা হলো ঃ যাকাত ,ওশর, ওয়াকফ , বায়তুল মাল ইত্যাদি । দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম এসকল নানাবিধ বৈধ লেনদেন ব্যাপক গুরুত্ব দেয়। ইসলামে রাষ্ট্রীয় সম্পদের বণ্টন ৩ প্রকার। ১, গনিমতের মান , সাদকা খয়তাত ৩, মাল -এ- ফাঈ

ওয়াকফ

উমাইয়া শাসন থেকে শুরু করে সাম্রাজ্যবাদ উত্থানের আগ পর্যন্ত দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি, জনকল্যাণ ও শিক্ষা সম্প্রসারণে ওয়াকফ ব্যাপক ভূমিকা পালন করে । এ ব্যবস্থায় দেশে দেশে মসজিদ , মাদ্রাসা, হাসপাতাল ইত্যাদি গড়ে ওঠে। প্রথমে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল স্তরের মুসলিমের জন্য ওয়াকফ ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ওয়াকফ ব্যবস্থাপনায় স্থান পায় মসজিদ নির্মাণ, লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল নির্মাণ, সড়ক ও পথ নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন, অতিথি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং মাদরাসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাজারো মসজিদ প্রতিষ্ঠার পেছনে ওয়াকফকারীদের উদ্দেশ্য ছিল একটাই, মুসলিমদের জন্য জামাতে নামায আদায়ের সুব্যবস্থা করে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন এবং পরকালে অফুরন্ত প্রতিদান লাভ।শিক্ষাঙ্গনে আমরা মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ওয়াকফ ব্যবস্থায় নির্মিত শত শত মাদরাসা দেখতে ।

যাকাত ঃ

সমাজে আয় ও সম্পদের সুবিচারপূর্ণ বন্টনের ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ হাতিয়ার । যাকাত এর খাত বন্টিট হওয় ৮ শ্রেণির মানুষের মাঝে যেমন ঃগরীব ,মিসকিন্ঋণগ্রস্ত, মুসাফির্ক্রীতদাস এবং ক্ষেত্রবিশেষে নও মুসলিম। রাসূলে করীমের (স) মৃত্যুর পর মিথ্যা বনী দাবীকারীদের বিদ্রোহীদের মুখেও ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন- "যদি কারও কাছে উট বাধার রশি পরিমাণ যাকাত প্রাপ্য হয় আর সে তা দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করছি।" গোটা জাযিরাতুল আরবে যাকাত নেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। এর বিষয়টি আমাদের জানান দেয় যে , যাকাতের মাধ্যমে স্ত্যই অভাবীদের দারিদ্রতা ঘুচে । কিন্তু , আজ কিছু ব্যতিক্রম বাদে মুসলিম বিশ্বে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বাধ্যতামূলকবাবে যাকাত আদায় এবং তা বিলিবন্টনের ব্যবস্থা নেই। যাকাত আদায় ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছাধীন । অথচ খুলাফায়ে রাশিদূন (রা) ও তাদের পরবর্তী যুগেও রাষ্ট্রের কঠোর ও নিপুণ ব্যবস্থা ছিল যথাযথভাবে যাকাত আদায় ও তা উপযুক্তভাবে বন্টনের জন্যে। ।

উশর আদায়ের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য যেমন হ্রাস পায় গ্রামীন জীবনে ক্ষুধা ও দারিদ্রের মাত্রাও হ্রাস পায়। এই ব্যবস্থায় কৃষি পণ্যের আয়ের সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিত হয়। নিসাব পরিমাণ ফসল না হলে উশর আদায় করতে হয় না। উশর আদায় পদ্ধতিতে প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদে চাষী এমনকি বর্গচাষীরাও রেহাই পায় । এর ফলে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠাই নিশ্চিত হয়।
সম্পদের অসম বণ্টনজনিত আমাদের সমাজের মানুষের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে না ফলে সমাজে অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করে । ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সেই সুযোগ থাকে না ।

শাসনব্যবস্থা

ইসলামের আগমন হয়েছিল , প্রতিটি মানুষকে আল্লাহর জমিনে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য । এরই সাথে , মানুষের ন্যায্য অধিকার সুরক্ষা এবং তাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ও সমুন্নত রাখার জন্য। তা ছাড়াও শরিয়ত নানা অবকাঠামো এবং উদার নিয়মের প্রচলন ঘটিয়ে যা ন্যায়বিচারের সুরক্ষার পথ সুগম করেছে ।

মানুষের ধর্ম সুরক্ষা ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ হল খলিফা, আমিরুল মুমিনিন বা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান । ইমাম মাওয়ারদি রহ.-এর মনোনীত সাতটি শর্ত খলিফা হওয়ার জন্য তার একটি হলো প্রয়োজনীয় সকল শর্তসহ ন্যায়পরায়ণ হওয়া। আমাদের

সমাজে তো চাইলেই যে কোন পেশার মানুষ নেতা হয়ে যায় । কিন্তু , ইসলামে কিছু গুনে গুনান্বিত না হলে নেতা হওয়া তো দূরের কথা , পদ প্রার্থনা করা যায় না। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. নেতৃত্বপ্রার্থী বা মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে বেশ কিছু গুণ থাকা আবশ্যক বলেছেন তা হলো, নেতৃত্বের জন্য চারটি গুণ অবশ্যই লাগবে। এর একটিতে যদি সামান্য ঘাটতি থাকে, তবে সে নেতৃত্বের যোগ্য নয়। শর্তগুলো হলো: ন্যায়সংগত পন্থায় অর্থ উসুলের সামর্থ্য, যথাযথ পদ্ধতিতে অর্থ ব্যয়, স্বেচ্ছাচারিতা না করে কড়াকড়ি আরোপ এবং লজ্জায় না ফেলে এমন নম্রতা অবলম্বন। [44]

ইতিহাসে পাতা উল্টালে দেখা যায় , তখনকার গভর্নর ও শাসকগণ ছিলেন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে বহুমাত্রিক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী কারণ নেতা নির্বাচনে সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ,আমর ইবনুল আস রা. এর কথা । মিশরের গভর্নর হিসেবে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর নিয়োগ করা বিশিষ্ট এই সাহাবি মাত্র তিন হাজার পাঁচশ যোদ্ধা নিয়ে মিশর অভিযানে যান। [45]

শ্রমিকের অধিকার

ইসলাম একজন শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি প্রদানে নির্দেশ দেয়। এক্ষেত্রে , সব রকমের জুলুম হারাম। পুঁজিবাদীরা বিপুল পরিমাণ সম্পদের পাহাড় গড়ায় ব্যস্ত থাকে ন্যায্য মুজরি প্রদানে অনিহা দেখায় ফলে সমাজের এক শ্রেণির মানুষের কাছে অনেক সম্পদ জমে যা ইসলাম সমর্থন করে না.। মে মাসের ৫ তারিখ যদিও আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করা হয় কিন্তু, বিশ্বে নানা দেশে শ্রমিক তাদের ন্যায্য অধিকার পাচ্ছেনা। শ্রমিকের প্রতি সদয় ব্যবহার , ন্যায্য মজুরি প্রদান, সাধ্যমত কাজ প্রদান , মানবিক ও সম্মানজনক আচরণএর প্রতি ইসলাম খুব জোর দেয়। ইসলামে মানুষের সাথে ধোঁকা বা প্রতারণা হারাম । কুরআনে আল্লাহ বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর" {সূরা আল-মায়িদাহ: ১}

এছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
«مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ»

[44] তারতুশি , সিরাজুল মুলুক ।পৃ ৫০
[45] ইবনে আবদুল হাকাম, ফুতুহু মিসর ওয়া আখবারুহা, পৃ. ৬৫।

"ধনী ব্যক্তির (পক্ষ থেকে কারও পাওনা প্রদানে) টাল-বাহানা করা জুলুম; আর যখন তোমাদেরকে কোনো আদায় করতে সক্ষম [46]

অপর হাদীসে এসেছে,

«قال الله :ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة :رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره»

"মহান আল্লাহ বলেন, তিনজন আমি তাদের বিপক্ষে থাকব কিয়ামতের দিন, তন্মধ্যে একজন হচ্ছেন, যাকে আমার জন্য প্রদান করার পর সে তার সাথে গাদ্দারী করেছে, আর একজন হচ্ছেন, যে কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার অর্থ খেয়েছে। আর একজন হচ্ছে সে ব্যক্তি যে কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করার পর তার থেকে তার কাজ বুঝে নিয়েছে অথচ সে তাকে তার প্রাপ্য দেয় নি।" (বুখারী, হাদীস নং ২২২৭]

অপর হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ»

"শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দাও[47]

ইনসাফের বিপরীতে আছে জুলুম তাই এ বিষয়ে বান্দার অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে ।
আবূ যর গিফারী রাদিআল্লাহ আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা 'আলা ইরশাদ করেন,

« يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا ».

'হে আমার বান্দা, আমি নিজের ওপর জুলুম হারাম করেছি এবং একে তোমাদের মাঝেও হারাম করেছি। অতএব তোমরা পরস্পর জুলুম করো না।' (মুসলিম : ৬৭৩৭)

কিছু মূলনীতির আলোকে ইসলামি ন্যায়বিচার মালিক- শ্রমিকের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পারে ।যার ফলে বান্দার হক আদায় হবে , জুলুম বন্ধ হবে , অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে সামাজিক শান্তি ও রাষ্ট্রীয় সমৃদ্ধি অর্জন হবে । যেমন ঃ চুক্তিকালে শ্রমগ্রহীতা যা যা শর্ত করেছিলেন শ্রমিকের সেসব প্রাপ্তি ,মজুরি প্রাপ্তির অধিকার, শ্রমিকের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন কাজে বাধ্য না করা , শ্রমিকের ওপর আল্লাহ যা ফরয করেছেন তা আদায়ের অধিকার (নামাজ, রোজা), শ্রমিকের অভিযোগ করা এবং বিচার প্রার্থনায় বাঁধা না দেয়া ইত্যাদি।

---

[46] বুখারী, হাদীস নং ২২৮৭; মুসলিম, হাদীস নং ১৫৬৪)

[47] ইবন মাজাহ: ২৪৪৩, সহীহ

ইসলামের ইনসাফভিত্তিক বিচারবিভাগ

জনগণের মাঝে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইসলামি বিচারব্যবস্থা অনন্য ও সুউচ্চ আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। বিচারবিভাগ খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যালয়। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় এটাই ইসলামের সর্বোচ্চ বিভাগ। এই বিভাগের দায়িত্ব হলো কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে শরিয়তসম্মত বিধান মোতাবেক বাদী-বিবাদীর মাঝে সৃষ্ট বিরোধের মীমাংসা ও সমাধান করা। [48]

মুসলিমদের এই সাম্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রণীত বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে জনগণের সকল অধিকার সুরক্ষা করা। শুধু মুসলিম নয় ,অমুসলিমদের জন্যও শরিয়ত অনুমোদিত সকল বৈধ উপাদান সরবরাহ ও সহজলভ্য করা হয় সেই নববী যুগ থেকে। ইসলামি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাঝেই ন্যায়, ইনসাফ ও সমতা বিধানের পূরণ প্রতিফলন ঘটে। গত কয়েক শতকে ন্যায়বিচার এর কথা বলা হচ্ছে নিঃসন্দেহে তার সবগুলো উপাদান ইসলামি সভ্যতা থেকে ধার করা । বিপরীতে আমরা শুধু তাদের চাপানো সামান্য কিছু নীতি গ্রহণ করে তাদের অনুসারী হয়ে গেছি। বিচারবিভাগ প্রতিষ্ঠায় একসময় মুসলিমরা ছিল সর্বোন্নত ও শ্রেষ্ঠ জাতি। কিন্তু , আমরা আমাদের অস্তিত্বের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে পশ্চিমাদের শেখানো বুলি আওড়াচ্ছি।

ইসলামি বিচারবিভাগ এর দরজা সবসময় ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য তাদের সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য খোলা ছিল। ইসলামি বিচারবিভাগ শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও যথার্থতার নিশাণ ছিল । কিন্তু , আধুনিক সমাজ আজ সেই ন্যায়বিচারে নীতিকে ভুলে মনগড়া নীতিতে চলে সভ্যতাকেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।তাদের রচিত বিধানগুলো মানুষের তৈরি করা যাতে ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক।কিন্তু ,মুসলিমগণ নিজ থেকেই ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ আবিষ্কার করেনি ।তারা এই মহান পবিত্র ব্যবস্থা ঐশী বানী থেকে পেয়েছে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إنَّما أنا بَشَرٌ وإنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، ولَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ ألْحَنَ بحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، وأقْضِي له علَى نَحْوِ ما أسْمَعُ، فمَن قَضَيْتُ له مِن حَقِّ أخِيهِ شيئًا، فلا يَأْخُذْهُ فإنَّما أقْطَعُ له قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»

আমি তো একজন মানুষ। আর তোমরা আমার কাছে বিবাদ মীমাংসার জন্য এসে থাকো। তোমাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষের চেয়ে যুক্তি প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে বেশি পারদর্শী হতে পারে। ফলে আমি যেভাবে শুনেছি, সেভাবে রায় দেওয়ার ফলে কাউকে যদি তার অপর

---

[48] ইবনে খালদুন, আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি, খ. ১, পৃ. ২২০।

ভাইয়ের অধিকার দিয়ে দিই, তাহলে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কারণ বস্তুত আমি তার জন্য জাহান্নামের এক টুকরো আগুন প্রদান করেছি।[49]

উক্ত হাদিস সত্য বিকৃতি ও গোপন করা থেকে বারণ করে ।এছাড়াও , বাদী-বিবাদী উভয়কে বাস্তবতা জাল করা, নিজ স্বার্থের পক্ষে অসাধু যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শন করা এবং অন্যায়ভাবে তাকে সমর্থন দেওয়া থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এই বিষয়গুলো মেনে চললে , ইসলামি শিক্ষা প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়কে সকল অনিষ্টের বিরুদ্ধে সচেতন রেখে তাকওয়াবান হিসেবে গড়ে তুলবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ বিচারক । তিনি নিজে সেই সময়কার সমস্যাগুলোর বিচার করতেন । সকল সমস্যার ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ শরিয়ত অনুযায়ী বিচার বাস্তবায়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছে। বিচারকার্যে প্রধান দুটি উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। মামলা নিষ্পত্তিতে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস-এ চারটি মৌলিক উৎসে কোনো উদ্ধৃতি পাওয়া যায় না, তখন বিচারক সেসব বিষয়ে নিজে ইজতিহাদ বা গবেষণা করতে পারবেন। আমর ইবনুল আস রা. আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

«إذا حكم الحاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرُ

একজন বিচারক বিচারকার্য সম্পন্ন করতে গিয়ে যখন ইজতিহাদের পথ অবলম্বন করে সঠিক রায় প্রদান করেন, তখন তার জন্য দুটি পুরস্কার লেখা হয়। আর ইজতিহাদ করতে গিয়ে যখন ভুল করেন তখন তার জন্য একটি পুরস্কার লেখা হয়।[50]

বিচারকের গুণাবলি

ইসলামে বিচারকের কিছু গুনাবলি থাকা প্রয়োজন যেমন ঃ প্রথমত, কথা ও কাজে সবসময় আল্লাহর ভয় লালন করেন। শরিয়হ এর বাইওরে গিয়ে বিচারক কোন রায় দিতে পারেন না। তাই ,ইসলাম জুলুমকারী এবং সুবিচার বর্জনকারী বিচারকদের কঠোরভাবে সতর্ক করেছে। আল্লাহর বিচারনীতি অবজ্ঞার ফলে দ্বিগুণ অপরাধী সাব্যস্ত হয়। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ«

বিচারক তিন প্রকারের। দুই প্রকারের বিচারক জাহান্নামি এবং এক প্রকারের বিচারক জান্নাতি। জেনেশুনে যে বিচারক অন্যায় রায় প্রদান করে সে জাহান্নামি। সত্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি

---

[49] বুখারী হাদিস নং ৬৫৬৬, মুসলিম, হাদিস নং ১৭৩১

[50] বুখারি, হাদিস নং ৬৯১৯; মুসলিম, হাদিস নং ১৫।

না করেই যে বিচারক মানুষের অধিকারসমূহ বিনষ্ট করে দেয়, সেও জাহান্নামি। আর যে বিচারক ন্যায় বিচার করে সে জান্নাতের অধিকারী। [51]

দ্বিতীয়ত ,বিচারককে সবসময় বাদী-বিবাদীর মাঝে পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রা.-কে উপদেশ দিয়ে গিয়ে বলেন,

إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنَّك إذا فعلت ذلك تبيَّنَ لَكَ القضاء

তোমার কাছে যখন দুই ব্যক্তি বিচারের আবেদন করবে, তখন দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য সম্পূর্ণ না শুনে প্রথম পক্ষের কথার ওপর ভিত্তি করে রায় প্রদান করো না। আর খুব শীঘ্রই জানতে পারবে, তুমি কীভাবে ফয়সালা করছ। [52]

তৃতীয়ত ,রাগের মাথায় একজন বিচারক রায় প্রদান করবে না।। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

কোনো বিচারক যেন রাগের মাথায় দুইজনের মাঝে ফয়সালা না করে। [53]

চতুর্থত , ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচারককে উপযুক্ত বেতন প্রদান করতে হবে।ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচারককে উপযুক্ত বেতন প্রদান করতে হবে। কোনো প্রকার উপঢৌকন গ্রহণ করা [54]থেকে তাকে নিষেধ করতে হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

---

[51] তিরমিযি, হাদিস নং ১৩২২; আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৫৭৩; ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২৩১৫।

[52]তিরমিযি, হাদিস নং ১৩৩১; আহমাদ, হাদিস নং ১২১০।

[53] বুখারি, হাদিস নং ৬৭৩৯; মুসলিম, হাদিস নং ১৬

[54] [আবদুল মুনয়িম মাজেদ, তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যা ফিল-উসুরিল উসতা, পৃ. ৫৩।]

বেতন ধার্য করে কাউকে আমরা কোনো কাজের দায়িত্ব প্রদান করার পর সে যদি তা থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে, তাহলে সেটা চুরি বলে বিবেচিত হবে। [55]

ইসলামি সমাজে বিচারবিভাগের অপরিসীম গুরুত্বের কথা চিন্তা করে মুসলিম জ্ঞানী-মনীষী ও বিজ্ঞজনেরা সমাজে সুবিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বিচারকদের উপদেশ দিতেন। আবু মুসা আশআরি রা.-কে কুফার বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পাঠানোর সময় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তার উদ্দেশে একটি নাতিদীর্ঘ উপদেশবাণী লেখেন। যার সারমর্ম ছিল,

পর সমাচার এই যে, মনে রাখবেন বিচারকাজ একটি চিরন্তন ফরয এবং অনুসৃত রীতি। আপনাকে যেহেতু এ কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হচ্ছে, তাই এ কাজটি আপনি ভালো করে উপলব্ধি করুন। কারণ বাস্তবায়ন ছাড়া শুধু মুখে বলে কোনো লাভ নেই। আপনার অবয়ব, আপনার ন্যায়বিচার এবং আপনার বিচারিক মজলিসের মাধ্যমে মানুষের মাঝে সুখ বিতরণ করুন। আপনার দুর্বলতা দেখে কোনো অসাধু ব্যক্তি যেন লোভের চিন্তা না করতে পারে এবং আপনার সুবিচার থেকে কোনো দুর্বল ব্যক্তি যেন হতাশ না হয়ে পড়ে। মনে রাখবেন, বাদীর কর্তব্য হলো উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করা। আর বিবাদীর কর্তব্য হলো শপথ করা। মুসলিমদের মাঝে চুক্তি সম্পাদন করা বৈধ। তবে এমন কোনো চুক্তি করা যাবে না যা হারামকে হালাল করে অথবা কোনো হালালকে হারাম সাব্যস্ত করে। গতকালের করা ফয়সালা যদি আজ আপনার কাছে ভুল মনে হয়, তাহলে ওই রায় প্রত্যাহার করে নিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হবেন না। কারণ সত্য চিরন্তন। আর মিথ্যা রায়ের ওপর অবিচল না থেকে সত্যের দিকে ফিরে আসাটাই উত্তম। কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে যে বিষয়ের সমাধান আপনি খুঁজে পাবেন না, তার সমাধান আপনি আপনার বোধশক্তি, উপলব্ধি এবং হৃদয়ে উদিত হওয়া ফয়সালার ওপর ছেড়ে দেবেন। অনুরূপ মামলা ও মীমাংসার ওপর অনুমান করে রায় দিয়ে দেবেন। [56]

অপরদিকে অনেক বিচারক বিচারকার্য পরিচালনার বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতেন। তারা ভাবতেন, এ মহান কাজের বিনিময় গ্রহণ করলে এ পদের অবমূল্যায়ন হবে। তাদের অন্যতম হলেন আন্দালুসের বিখ্যাত বিচারক ইবনে সাম্মাক হামাযানি।

বিচারবিভাগকে সকল প্রকার স্বার্থসিদ্ধির ঊর্ধ্বে রাখতে এবং যাবতীয় অন্যায় ও অবিচার থেকে মুক্ত রাখতে শাসকগণ বিচার কার্যক্রমের ওপর কঠোর নজরদারি আরোপ করেছেন। কোনো বিচারক দুর্নীতি, অবিচারের আশ্রয় নিলে তাকে পদচ্যুত করেছেন।

[55] আবু দাউদ, হাদিস নং ২৯৪৩; ইবনে খুযাইমা, হাদিস নং ২৩৬৯: মুসতাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১৪৭২
[56] ইবনে খালদুন, আল-ইবারু ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদায়ি ওয়াল-খাবারি, খ.১, পৃ. ২২১

আব্বাসি শাসনামলে বিচারবিভাগ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। যার ফলে আমরা দেখি, অনেক বিচারক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী খলিফা বা সরকারি উচ্চপদস্থ লোকদের বিরুদ্ধে শক্ত ও কঠিন অবস্থান নিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। সুষ্ঠু ও ন্যায্য বিচার প্রতিষ্ঠায় তারা কারও হুমকি-ধমকির ও নিন্দাবাক্যের তোয়াক্কা করতেন না। একবার বিখ্যাত প্রতাপশালী আব্বাসি শাসক আবু জাফর মনসুর বসরার বিচারক সাওয়ার ইবনে আবদুল্লাহর কাছে পত্র লেখেন, অমুক জমি নিয়ে একজন সেনাপতি এবং একজন ব্যবসায়ীর মাঝে বিরোধ চলছে, সেই জমিটি আবদুল্লাহর কাছে পত্র লেখেন, অমুক জমি নিয়ে একজন সেনাপতি এবং একজন ব্যবসায়ীর মাঝে বিরোধ চলছে, সেই জমিটি আপনি সেনাপতির কাছে হস্তান্তর করুন। উত্তরে সাওয়ার লেখেন, উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে, জমিটি ওই ব্যবসায়ীর। তাই কোনো প্রমাণ ছাড়া তার কাছ থেকে আমি জমি নিয়ে সেনাপতিকে দিতে পারব না। প্রত্যুত্তরে বাদশা মনসুর লেখেন, ওই আল্লাহর শপথ! যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, অবশ্যই আপনি ওই জমিটি সেনাপতির কাছে হস্তান্তর করবেন। এর উত্তরে সাওয়ার লেখেন, ওই আল্লাহর শপথ! যিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া জমিটি ব্যবসায়ীর হাতছাড়া করব না। এই পত্রটি পড়ে মনসুর বলেন, আল্লাহর শপথ, এই ভূখণ্ডকে আমি ন্যায়বিচার দিয়ে পরিপূর্ণ করেছি। আমার বিচারকগণ সত্য ও ন্যায়ের দিকে আমাকে ফিরিয়ে এনেছে। [57]

কত সুন্দর ছিল আমাদের বিচারব্যবস্থা !এই অনিন্দ্যসুন্দর বৈশিষ্ট্য ও ন্যায্য বিচারের মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সুমহান এই বিচারব্যবস্থার ছত্রছায়ায় মুসলিম সমাজে ন্যায়, নিষ্ঠা ও ইনসাফের জয়জয়কার ছিল। আমরা যদি আমাদের সমাজে এমন ইনসাফের চিত্র পেতে চাই আমাদের অবশ্যই ইসলামের বিচারব্যবস্থার দারস্থ হতে হবে।

[57] সুয়ুতি, তারিখুল খুলাফা, পৃ. ২২৯

সংখ্যালঘুদের সাথে ন্যায়বিচার

ইসলাম কুরআন ও হাদিসে বিধর্মীদের প্রতিও ন্যায়বিচার করার আদেশ করেছে । ইসলামের সংখ্যালঘুদের প্রতি ইনসাফ গোটা দুনিয়ার মানুষের কাছে বিস্ময় । ইতিহাসে যা নজিরবিহীন ।তাদের অধিকার যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে। মুসলিমদের বারবার সতর্ক করা হয়েছে ,দুর্বল ভেবে তাদের ওপর বিন্দুমাত্র জুলুম যেন না করা হয় । ইসলাম শরীয়হভাবে মুসলিমজাতির কাঁধে স্বধর্মী-বিধর্মী সকলের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার এক মহান দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে ।বিধর্মীদের প্রতি ইসলামের সুবিচার প্রয়োগের বিধান বিশ্বসভ্যতায় ছিল একেবারেই নতুন বিষয় যা অন্য কোন সভ্যতা , অন্য কোন ধর্ম করে দেখাতে পারেনি ।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أو انتقصَه حَقًّا، أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا خصمه يوم القيامة

যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোনো (বিধর্মী) লোকের ওপর অবিচার করবে বা তার প্রাপ্য কম দেবে বা সামর্থ্যের বাইরে তার ওপর কিছু চাপিয়ে দেবে অথবা সন্তুষ্টিপূর্ণ সম্মতি ছাড়া জোরপূর্বক তার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবে, কেয়ামতের দিন আমি নিজে তার বিপক্ষে বাদী হব। [58]

ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার পুরস্কারও ঘোষণা করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«تَعْدِيْلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ

দুজন ব্যক্তির মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সদকা। [59]

ইসলামী শরিয়ত অমুসলিমদের সম্পদ হেফজত করার তাকিদ দেয়। অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ গ্রহণ করা এবং তাদের উপর জবরদখল করাকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যমানায় নাজরানবাসীদের ক্ষেত্রে এর বাস্তব প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে- "নাজরান ও তার আশপাশের লোকদের ধন-

---

[58] আবু দাউদ, হাদিস নং ৩০৫২; বাইহাকি, হাদিস নং ১৮৫১১
[59] বুখারি, হাদিস নং ২৮২৭; মুসলিম, হাদিস নং ১০০৯

সম্পদ, ধর্ম ও উপাসনাগৃহের উপর আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দায়িত্ব রয়েছে। তাদের কমবেশী যা কিছু আছে সব তাদেরই থাকবে।[60]

একবার রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লাশের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় সেখানে দাড়ালেন। তাকে বলা হলো- "হে আল্লাহর রাসুল, এটা এক ইহুদীর লাশ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- সে কি মানুষ নয়?[61]

তাদেরকে দান-সদকা করার ব্যাপারে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন- "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদী পরিবারকে দান করতেন। আর তা ইহুদীদের কাছেও পৌছে দেয়া হতো।"[62]

এভাবে , ইসলাম অমুসলিমদের ব্যাপারে মানবতা দেখিয়েছে, যা নজীরহীন। আজ জঙ্গীবাদের সাথে ইসলামকে যারা জুড়ে দেয় তারা কি এমন দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে কোন সভ্যতা বা অন্য কোন ধর্মে ? একজন মুসলিম হিসেবে আমাদেরও উচিত তাদের প্রতি ইনসাফ করা যা ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়।

---

[60] দালায়েলুন নবুওয়াহ:-৪৮৫/৫ আত তাবাকাতুল কুবরা: ২৮৮/১

[61] সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ২৪১৬ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৮২৯

[62] আল আমওয়াল লি আবী উবাইদ ৬১৩

নারীবাদ ও ইসলামি ন্যায়বিচার

নারীবাদ বা ফেমিনিজম শব্দের সাথে বর্তমান বিশ্বের মানুষ আজ পরিচিত । এটি একটি ধর্মবিদ্বেষী দর্শন যা অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে শুরু হওয়া ইউরোপে নারীর অধিকার আদায়ের সামাজিক আন্দোলন ।নারীবাদের ফিতনার কবলে আজ মুসলিম- অমুসলিম সকল নারী । বিশ্বসভ্যতায় নারীর প্রতি কি পরিমাণ অন্যায় অবিচার হত তা ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই । তবে নারীকে সকল জুলুম থেকে মুক্ত করে তাকে ইনসাফ দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে "নারী মুক্তি " আন্দোলনের যে সূচনা বা নারীবাদের যে যাত্রা শুরু তা লিঙ্গভেদ বৈষম্যকে উস্কে দেয়। আর , নারী মন মগজ পুরুষের প্রতি বিষিয়ে দিয়ে পুরুষকে বানিয়ে দেয় তার **প্রতিদন্দ্বী** । তো এতকিছু করেও কি নারী তার অধিকার ফিরে পেয়েছে নাকি তার প্রতি এতটুকু ইনসাফ করতে পেরেছে নারীবাদীরা ?

আজ নারীবাদী মনভাব লালণকারী একজন ব্যক্তি হোক সে মেয়ে বা ছেলে নিজেকে খুব গর্বিত মনে করে কিন্তু , ব্যক্তিগতভাবে সে কি নিজের প্রাপ্য অধিকার বুঝে পায় নাকি জুলুমের শিকার হয় না? এই যে নারীবাদী আন্দোলন এর সূচনা তাদের কথাই হলো ঃ নারীকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে ; তাকে বাইরে বের করো , সে পুরুষের দাষী হবে না ; সে হবে স্বাবলম্বী , তার আর্থিক দায়িত্ব সে নিজেই নিতে সক্ষম ; কারো কাছে হাত পাততে হবে না , নিজেই উপার্জন করবে , বিয়েব্যবস্থাকে গুড়িয়ে দাও ; তাই স্বামীকে ডিভোর্স দাও । নারীবাদ দিনশেষে নারীকে তো মুক্ত করতেই পারলোনা উল্টো পরিবার ও সমাজের স্বাভাবিক নিয়মনীতির মধ্য বিশৃংখলা সৃষ্টি করলো। উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেম মুফতী তাকী উসমানীর নিম্নোক্ত আলোচনায় বিষয়টি ফুটে উঠে।

আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম বলেন, "আমরা শেষমেষ এ দেশের নারী সমাজকে কোন্ পর্যায়ে পৌঁছাতে চাচ্ছি? নারীর অসম্মান, অসতিত্ব ও অপবিত্রতার এমন পর্যায়ে যা পশ্চিমা নারীর এক বিশাল অংশের; বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাগ্যে ছিল? যেখানে পৌঁছার পর নারিত্বের সবচে বড় সম্পদটুকুই খোয়া যায় নি; বরং প্রকৃতির সঙ্গে বিদ্রোহের ফলে সেখানে পরিবার ব্যবস্থায়ও ধস নেমেছে? অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, রাস্তা পরিষ্কার করা ও হোটেলে গ্রাহকদের বিছানা ঠিক করা থেকে শুরু করে নিজের শরীর দেখানো পর্যন্ত পৃথিবীর এমন ঘৃণ্য থেকে ঘৃণ্যতম কাজ নেই, যা নারীদের উপর চাপানো হয় নি। একদিকে সন্তান মাতৃমমতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, গৃহ-গৃহকর্ত্রীর অভাবে হাহাকার করছে, অন্যদিকে পথ ঘাট, হাট-মাঠ নারীর শোভা-সৌন্দর্যে মজে থাকছে; কৃত্রিম সাজে বাণিজ্য বিজ্ঞাপনের কাজ হচ্ছে, তার এক একটা অঙ্গকে লালসার টোপ বানিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে ডাক দেওয়া হচ্ছে। আসুন আমাদের সেবা নিন, আমাদের পণ্য কিনুন।'

আর যেসব যুক্তিতে নারীকে ঘরের বাইরে আনার চেষ্টা চলছে সে সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘‘নারীদের ঘরের বাইরে আনার জন্য বর্তমানে একটা যুক্তি ভালোই কাজ দিচ্ছে। তা এই যে, ‘জাতি গঠন ও জাতির উন্নয়নে আমরা আমাদের অর্ধ সমাজকে এভাবে নিষ্ক্রিয় রাখতে পারি না।’ যুক্তিটা শুনে মনে হয়, আমাদের দেশের সকল পুরুষকে কোনো না কোনো কাজে লাগিয়ে পুরুষের দ্বারা যতটুকু কাজে নেয়া সম্ভব তা পুরোপুরি করিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন কোনো পুরুষ বেরোযগার নেই; বরং হাজার হাজার কাজ পড়ে আছে ‘মানব শক্তির’ অপেক্ষায়।

অথচ এ ধরনের কথা এমন একটা দেশে কতটা যৌক্তিক? যেখানে অনেক উচ্চশিক্ষিত ডিগ্রীধারী পুরুষকেও কাজের জন্য ঘুরে মরতে হয়? যেখানে কোনো চাপরাশি অথবা ড্রাইভারীর বিজ্ঞাপন প্রচার হলে, শ শ গ্রাজুয়েট; আর ব্যাংকের জায়গা খালি হলে শ শ মাস্টার্স বা তদুর্ধ ডিগ্রীধারীগণও আবেদন করেন। প্রথমে পুরুষ ‘অর্ধ সমাজ’ কে রাষ্ট্র গঠন ও উন্নয়নের কাজে পুরোপুরি লাগান। এরপর বাকি ‘অর্ধ আবাদি’ নিয়ে ভাবা যাবে, তা সচল না অচল?

তাছাড়া যে নারী জাতির পরিবার ব্যবস্থার মৌলিক সেবাগুলো প্রদান করছে, অর্থাৎ ভবিষ্যতের কর্মপুরুষদের লালন-পালন করছে এবং তার অমূল্য নারিত্ব সম্পদ দিয়ে সমাজে পবিত্রতা, অনাবিলতা এবং সতিত্ব ও চরিত্রের উন্নততর মূল্যবোধ রক্ষার পূতকার্য সম্পন্ন করছে তাকে ‘অচল অঙ্গ’ বলে ব্যক্ত করা পাশ্চাত্যের কূতর্কেরই কারিশমা। যাদের চোখে কর্মক্ষম শুধু সে-ই যে বেশি থেকে বেশি অর্থ উপার্জন করে; এতে সারা দেশে যতই নৈতিক ধ্বস নামুক আর চরিত্র বিধ্বংসী বীজ ছড়াক। আর যে উপার্জন করে না সে-ই ‘অচল অঙ্গ’ , সমাজের নীতি নৈতিকতার বিনির্মাণে তার শত অবদানই থাকুক না কেন।

জানতে চাই ‘পরিবার ব্যবস্থা’ ও সমাজের কোনো অংশ কিনা? এবং ব্যক্তির চরিত্র ও কর্মও সমাজের কোনো রক্ষাযোগ্য বিষয় কিনা?...’’ [63]

নারীবাদীরা বিভিন্নদিক থেকে ইসলামে “ নারীর অধিকার” নিয়ে প্রশ্ন তলে । তাদের চোখে , ইসলাম নারীর প্রতি কোন ন্যায়বিচার এর পথ খোলা রাখেনি। নারীকে বানিয়েছে পুরুষের দাসী । ইসলামী বিধান নিয়েও তাদের নানা প্রতিবাদ । নিম্নে সেই দিকগুলো তুলে ধরা হলো যা নারীবাদীদের আপত্তি এবং ইসলাম কিভাবে সেসব ক্ষেত্রে নারীর প্রতি ইনসাফ করছে তাও তুলে ধরা হলো ঃ

[63] (ইসলাহে মুআশারাত/সমাজ সংশোধনের দিক নির্দেশনা,মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী,রাহনুমা প্রকাশনী,বাংলাবাজার থেকে প্রকাশিত,পৃ. ১০৪,১০৫)

উত্তরাধিকার আইনে নারীর প্রাপ্য অংশ ঃ

বিশ্বে ইসলামি সর্বপ্রথম সম্পদ বা উত্তরাধিকার সম্পদে, নারীকে অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা দিয়েছে। অন্যকোন ধর্ম, বা সভ্যতা সত্যিকারের কোন অধিকার, বা মর্যাদা দেয়নি, বরং নারীকে অপমান ও অমর্যাদার মোক্ষম বস্তু হিসেবে দেখতো। মোহরানা, ভরণপোষণ ও উত্তরাধিকার এই তিনটি সূত্রে সম্পদ লাভ করে একজন মুসলিম নারী ।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা নিসার ১৭৬ নং আয়াতে বলেছেন , পুরুষ দুই নারীর অংশের সমান পাবে । এটাই তাদের মুল আপত্তি । কেন নারী পুরুষের সমান পাবে না , কেন তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে । একটা বিষয় মানতেই হবে , এই বিধান কোন মানুষের তৈরি না এটা ঐশী বিধান যা খন্ডাবার অধিকার কারো নেই । নারী যাবিল ফুরূয এর একজন । যাবিল ফুরূয বলা হয় কোরআনে যে মোট বারজনের জন্য মীরাছে অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের মধ্য আটজনই নারী, চারজন পুরুষ।যাবিল ফুরুয নারীগণ হচ্ছে : ১. স্ত্রী ২. মাতা ৩. দাদী, নানী, দাদীর মাতা, দাদার মাতা ৪. কন্যা ৫. পুত্রের কন্যা, পুত্রের পুত্রের কন্যা ৬. সহোদরা বোন ৭. বৈমাত্রেয় বোন ৮. বৈপিত্রেয় বোন। আসাবাতেও নারীর অংশ আছে।যাবিল ফূরুযগণ তাদের অংশ নেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ যারা পায় তাদেরকে আসাবা বলা হয়। আসাবা দ্বিতীয় স্তরে চার প্রকারের নারী আর তৃতীয় স্তরে শুধু এক প্রকারের নারী।

আবার , স্বামী মারা গেলে মীরাছ বণ্টনের আগে , স্ত্রীর মোহর অনাদায়ী মোহর থাকলে আগে তা আদায় করা, তারপর অবশিষ্ট সম্পদ বণ্টন করতে হবে।স্বয়ং আল্লাহ তা ‘আলা নারীর সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পণ করেছেন তাকে অব্যাহতি দিয়েছেন যা নারীর প্রতি ইনসাফ এর প্রতীক ।

একজন মানুষের অধিকার নির্ধারিত হবে দায় ও দায়িত্বের পরিমাণ হিসাবে ।আর

স্ত্রীর জন্য স্বামী, মায়ের জন্য পুত্র, কন্যার জন্য পিতা এবং বোনের জন্য ভাই হলো অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য দায়িত্বশীল। তবু নারীকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কিন্তু পুরুষের সমান হলে সেটা হবে পুরুষের প্রতি অন্যায়। পুরুষ তাহলে দায়িত্ব পালনে উৎসাহী হবে কেন? তারপরো বলতে হবে যে, এ পার্থক্যটা শুধু প্রতীকী। অন্যথায় বাস্তবে একজন পুরুষ উত্তরাধিকার সূত্রে যা পায় সারা জীবন তার চেয়ে খরচ করে অনেক বেশী। পক্ষান্তরে নারীর শুধু প্রাপ্তি আছে, ব্যয় নেই। নারী যদি স্বেচ্ছায় ব্যয় করে তবে সেটা হবে দান ও ইহসান। পুরুষ যদি তা গ্রহণ করে তবে তাকে হতে হবে নারীর প্রতি কৃতজ্ঞ।পক্ষান্তরে পুরুষ কোনো কোনো ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারে নারীর দ্বিগুণ পায় সত্য, তবে সে স্ত্রীকে মোহরানা ও ভরণপোষণ প্রদান করে। স্ত্রী যত ধনী হোক, পরিবারের জন্য ব্যয় করতে বাধ্য নয়। পক্ষান্তরে স্বামী গরীব

হলেও তাকেই ব্যয় করতে হবে। ব্যয় করার সাধ্য না থাকলে তো তার বিবাহ করারই অধিকার থাকবে না। [64]

একথা সুস্পষ্ট যে, কম-বেশি শুধু নারী বা পুরুষ হওয়ার কারণে নয়; বরং দায়িত্ব, খরচ ও মৃতের সাথে সম্পর্কের মতো গভীর ও মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভিন্নতা সত্ত্বেও প্রাপ্তি ও অধিকারের অভিন্নতার দাবি করেন তাদের বক্তব্যের অসারতা বোঝার জন্য অনেক বেশি জ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। তাদের দর্শন মেনে নিলে তো গোটা পৃথিবীই অচল হয়ে যাবে।ধরুন একটি কোম্পানিতে কিছু পুরুষ এবং মহিলা কর্মরত আছেন। সেখানে প্রত্যেকের যোগ্যতা ও দায়িত্ব অনুসারে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা আবদুল করিম। তার বেতন ২০ হাজার টাকা। খালেদা ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন সাধারণ কর্মচারী। তার বেতন ১০ হাজার টাকা। এখন কোনো নারীবাদী যদি এখানে নারী-পুরুষের মাঝে বৈষম্য দেখতে পান এবং এই বৈষম্য দূর করার দাবি তোলেন তাহলে তা কি গ্রহণযোগ্য হবে? একই কথা উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রেও চিন্তা করা দরকার। এখানেও পুত্র ও ভাইকে কন্যা ও বোনের চেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে তাদের দায়িত্ব ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে ভিন্নতার কারণে। এই ভিন্নতাকে বিবেচনা না করে 'নারী-পুরুষের সমান অধিকার' নীতিতে সম্পদ বণ্টন করাটাই হবে বৈষম্য।

একটি সর্বস্বীকৃত নীতি হল, ''দায় অনুযায়ী প্রাপ্তি' ' এটাকে শরীয়তের ভাষায়একটি সর্বস্বীকৃত নীতি হল, ''দায় অনুযায়ী প্রাপ্তি' ' এটাকে শরীয়তের ভাষায়

الغنم بالغر বলা হয়েছে। অর্থাৎ যার দায় বেশি তার প্রাপ্তি বেশি, যার দায় কম তার প্রাপ্তি কম। পরিবার, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব পুরুষের উপর। শত্রুর মোকাবেলা করার দায়িত্বও পুরুষেরই। পরিবার ও সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণ, তাদের চিকিৎসা ও বাসস্থানের দায়িত্বও পুরুষের উপর । নারীর উপর এমন কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। বরং নারীর সকল খরচ পুরুষকে বহন করতে হয়। এমনকি যদি কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তাহলেও ইদ্দত চলাকালীন স্ত্রীর ভরণ- পোষণ ও থাকার ব্যবস্থা পুরুষের দায়িত্বে।[65]

---

64 'আমাদের পরিবারগুলো যেন হয়ে ওঠে নারী-অধিকার ও নারী-মর্যাদা রক্ষার আদর্শ অঙ্গন'
মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ https://www.alkawsar.com/bn/article/383/

65 https://www.alkawsar.com/bn/article/406/

বহুবিবাহ প্রসঙ্গে

ইসলামে বিয়ের প্রথাকেই যেখানে নারীবাদীরা সহ্য করতে পারে না সেখানে বহুবিবাহকে তো তারা মূল্যায়ণ করবে না এটাই স্বাভাবিক । অথচ , বহুবিবাহের দরুন যে ইনসাফ পালন হয় নারীর প্রতি তা কোনভাবে অস্বীকার করার উপায় নেই । যেমন ঃ একজন বিধবার বিয়ে হলে সে একজন স্বামীকে অভিভাবক হিসেবে পায় তার সম্মানও বাড়ে । অন্য দিয়ে , ৩০ এর কোটায় যে নারীর বিয়েই হচ্ছে না সে আজ প্রকাশ না করলেও অনুশোচনার আগুনে পুড়ে মরে। দ্বিতীয় বিয়ে কেবল তখনই হালাল বা বৈধ হবে যখন তা করা শরীয়তের উদ্দেশ্যের পরিপন্থি হবে না। অন্য কথায় শুধু বিশেষ অবস্থা যেমন প্রথম স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয়, বা এত বেশি রোগা হয়ে পড়ে যে, স্ত্রীত্বের দাবি পূরণে অক্ষম থাকে, বা দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে পুরুষের সংখ্যা হ্রাস হয়ে পড়ে- তখন বিধবা ও অবিবাহিতা নারীদের বৃহত্তর স্বার্থে সক্ষম ও সচ্ছল পুরুষরা একাধিক বিয়ের অনুমতি পাবে। তাও এই শর্তে যে, তারা স্ত্রীদের সাথে সমতাভিত্তিক ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার ।[66]

গৃহে অবস্থান ও পর্দা নারীর ধর্মীয় অধিকার

নারীবাদ এর ধারণা এই যে , ইসলাম নারীকে গৃহবন্দী করে রাখে , তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। আর , নারী পর্দা হলো তার সকল প্রতিবন্ধকতা । কিন্তু , একজন মুমিন নারী বিশ্বাস করে এটা তার ধর্মীয় অধিকার। এর ফলে , সামাজিক সুফল যে আছে তা তারা বুঝে না।আল্লাহ বলেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং জাহেলী যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। সূরা আহযাব [৩৩ : ৩৩]

আর, সূরা নূরের ৩১ নং এ আল্লাহ বলেছেন,
(হে নবী!) মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তা ছাড়া নিজেদের আভরণ প্রদর্শন না করে।

[66] আল বাহি আল খাওলী , ইসলামে নারী , পৃ ১১৩

যে নারী ইসলামের হেদায়াতের তলে আশ্রয় নিয়েছে তার কাছে এ বিধান অবশ্য পালনীয় । আজ নারীর প্রতি যেসব জুলুম হচ্ছে যেমন , ধর্ষণ , ইভটিজিং ইত্যাদি তার কারণ হিসেবে অনেকে অনেক কিছু বলে থাকেন । কিন্তু , একজন নারী যদি ঘরে অবস্থান করে ও পর্দা করে তবে তার জন্য এসব সহিংসতা এড়ানো সম্ভব । আজ কোন নারী নিরাপদ নয় । পর্দা করেও নারী সমাজে জুলুমের স্বীকার । কিন্তু , এর সংখ্যা কতটুকু তা পত্রিকার পাতার খবরে চোখ বুলালেও পাওয়া যায় । ঘর আর পর্দা নারীকে দেয় নিরাপত্তা , মর্যাদা । নারীর প্রতি ইনসাফ তখনই হবে যখন তাকে এই সমাজে নিরাপদ আশ্রয় দেয়া সম্ভব হবে। ঘর যে নিরাপত্তা দেয় তা একটা অফিস দিতে পারেনা।

পরিশেষে বলা যায় ,নারীর প্রতি ইনসাফ ও তার অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য আল্লাহর ওহীর সংস্পর্শে আসতে হবে।

আধুনিক সমাজে ন্যায়বিচারের পরিস্থিতি স্বরূপ

দুনিয়ার বুকে এমন একটা যুগ ছিল যা ছিল ঘোর অন্ধকারেপূর্ণ । হানাহানি , মারামারি , হত্যা ,চুরি- ডাকাতি , লুটপাট । যেন তখন ‘ জোর যার মুলুক তার’ নীতিতে চলত বিশ্ব । সেই সময়টাকে আমরা “জাহিলিয়াতি যুগ” বলে জানি । আজকে বিশ্ব যে গতিতে চলছে তা কি সেই ‘জাহিলিয়াতি যুগ থেকে ব্যতিক্রম? সংবাদমাধ্যম এর সুবাধে প্রতিনিয়ত অন্যায় – অবিচার , জুলুম- নিপীড়নের খবর আজ যেন বিস্ময় নয় , স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে । আজ বাতাস যেন ভারী হয়ে আছে মজলুমের বুকচাপা কান্নায় বা চিৎকারে । কত কত তাজা লাশ যার পরিচয়্‌ মেলে না । পরিবারের সাথে কখন একজন মানুষের শেষ দেখা হয়েছে অনেকে বলতে পারে না ।আর কতক পরিবার তার স্বজনের জন্য তো পথ চেয়ে বসে আসে জানেও না সে কি গুমের শিকার না মৃত ! এমন কোন অন্যায় নেই যা, সমাজে ঘটছেনা । কতশত আইন , কতশত মানবাধিকার সংস্থার জন্ম হয়েছে কিন্তু , প্রতিনিয়ত জুলুমের মাত্রা বেড়েই যাচ্ছে যার লাগাম ধরা যাচ্ছে না। “ বিশ্বশান্তি” শব্দটা আজ যেন সোনার হরিণ! শান্তিপ্রতিষ্ঠার কথা বলে বিশ্ববাসীকে আজ কি উপহার দিচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব ? এক অস্থির পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র যা মানুষের রাতের ঘুমকেও হারাম করছে । নবীজি (সাঃ) এর একটি হাদিস আছে যা , আমাদের বর্তমান যুগের সাথে মিলে যায়। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত,

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সে সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন, দুনিয়া ধ্বংস হবে না যে পর্যন্ত না মানুষের কাছে এমন এক যুগ আসে, যখন হত্যাকারী জানবে না যে, কি দোষে সে অন্য কে হত্যা করেছে এবং নিহত লোকও জানবে না যে, কি দোষে হত্যা করা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করা হলো, কিভাবে এমন অত্যচার হবে? তিনি জবাবে বললেন, সে যুগটা হবে হত্যার যুগ। এরূপ যুগের হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী হবে। সহিহ মুসলিম: ৭১৯৬ হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

আজ আমরা আধুনিক হয়েছি ঠিকই কিন্তু নৈতিকতার অবক্ষয় আমাদের এমন নিচে নামিয়েছে অন্যর হক নষ্ট করতে মানুষ একবারও ভেবে দেখে না । আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ‘’আদল ’ ’ গুনটি যদি প্রকৃতভাবে আমরা অন্তরে ধারণ করতে পারতাম তাহলে কাউকে হত্যার আগে দশবার ভাবতাম ।মানুষের মনগড়া মতবাদ পরিমাণে মানবতাকে ধ্বংসেরমুখে ঠেলে দিয়েছে তা প্রমাণের জন্যে মনে হয় না ইতিহাসের পাতা উল্টাবার দরকার আছে বরং সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি এর সেরা সাক্ষী। আফিয়া সিদিক্কার কথা আজও নিউজে আসে। ২০০৩ সালের ৩১ মার্চ ড.আফিয়া সিদ্দিকা (Aafia Siddiqui) পাকিস্তানের করাচিতে আই এস আই করতক অপহৃত হন। তিনি একজন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক যিনি ২০০৮ সালে নাটকীয় আফগানিস্তানে গ্রেফতার হন যদি বিগত ৫ অছরে মানুষ ভেবেছে তিনি ও তার সন্তানেরা মারা গেছে এবং পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচার ও কারাদণ্ডপ্রাপ্ত হন।

তাঁর মামলা আজও আন্তর্জাতিকভাবে বিতর্কিত এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে বড় উদাহরণ । এমন কোন নির্যাতন বাকি নেই যা তার ওপর করা হয়নি।

এত এত অরাজকতার পরেও বিশ্বনেতারা চুপ । অথচ , তারাই মানবাধিকার রক্ষার জন্য আইন বানিয়ে বসে আছে যেমন ঃ হিউম্যান রাইটস এক্ট ১৯৯৮ । জাতিসংঘ যদিও বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য গঠিত কিন্তু, আজ বিশ্বের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি জানান দিচ্ছে যে, এটি তার লক্ষ্য বাস্তবায়ণে ব্যর্থ । ইতিহাস এর পাতা ঘাটলে দেখা যায় , বিভিন্ন দেশের মধ্যে যেসব যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল তার নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্বের মানুষের মাঝে নিরাপত্তা উপহার দিতে জাতিসংঘ বরাবরই ব্যর্থ। বিশেষ করে চীন-ভিয়েতনাম যুদ্ধ , ইরান-ইরাক যুদ্ধ, ভিয়েতনাম কর্তৃক কম্পুচিয়া আগ্রাসন কিংবা কিউবার উপর যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক চাপ। ফিলিস্তিনে ইসরাইলি আগ্রাসন নতুন ঘটনা নয়। ছোট ছোট কত শিশু মারা যাচ্ছে , কত মা-বাবার বুক খালি হচ্ছে কিন্তু , শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সবক যারা শুনায় আজ তারাই ব্যর্থ !" আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ .أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি।মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না। সুরা বাকারা ১১-১২

"জাতিগত বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষণা গৃহীত হলেও, বিগত বছরগুলোতে ধনী ও গরিব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ব্যবধান আরো বেড়েছে। গরিব দেশগুলোর ঋণের পরিমাণ দিনে দিনে বাড়লেও, জাতিসংঘ দ্বন্দ্বের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে আফ্রিকায় রুয়ান্ডা-বুরুন্ডিতে কিংবা ইউরোপে বসনিয়া হার্জেগোভিনা ও কসভোতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ও লক্ষ লক্ষ মানুষের দেশান্তরিত হওয়ার রোধ করার ব্যাপারে জাতিসংঘ আদৌ কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি। এমনকি জাতিসংঘ এসব দেশে গণহত্যার সাথে যারা জড়িত, তাদের সবাইকে বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে সোপর্দ করতে পারেনি।[67]

মানবতার ফেরিওয়ালা খ্যাত আমেরিকায় সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশি সহিংসতা ও সামরিক অভিযানে বেসামরিক মানুষের মৃত্যুর হার উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে । ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশ অন্তত ১,৩৬৫ জনকে হত্যা করেছে, যা গত এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যা।[68]

[67] "https://www.easyinfobd.com/2024/10/blog-post_6.html

[68] সংখ্যা।https://campaignzero.org/research/mapping-police-violence-2024-was-the-deadliest-year-for-police-violence/

ইসলামি বিদ্বেষ এত প্রকোপ আকার ধারণ করেছে যে , ইসলামে ন্যায়বিচারের যে মাপকাঠি আছে শুধুমাত্র সেই বিষয়গুলো অনুসরণ করলে ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব তা যেন গোটা মুসলিম উম্মাহ ভুলতে বসেছে। আজ মুসলিমরা হয়ে গেছে সংখ্যালঘু ।তবে আজ গোটা সমাজে শুধু মুসলিমরাই নয় , অমুসলিমরাও ন্যায়বিচার চেয়ে পাচ্ছেনা । ধনী- দরিদ্র বৈষম্য ,জাতপ্রথা আজও মানুষকে ন্যায়বিচার পেতে বাঁধা দেয়। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু দেশের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরা হলো যা , বিশ্বজুড়ে ইনসাফহীন সমাজের চিত্র তুলে ধরে।

ফিলিস্তিন

ফিলিস্তিনিদের গণহত্যা, নির্যাতন, নিপীড়ন আজ বিশ্বের কাছে নতুন নয় । ক্রমাগত ইহুদি আগ্রাসন চলছে তো চলছে । 'মানবাধিকার' শব্দটি ফিলিস্তিনবাসীর জন্য যেন প্রযোজ্য নয় । ১৯৪৮ সালের ১৪ মে স্বাধীন ইসরায়েল রাষ্ট্রের ঘোষণার আগে থেকেই যে জুলুম চলছে আজ ২০২৫ সালে সে তার মাত্রা হাজার গুণ বেড়েছে ।

বোমা বিস্ফরণে আকাশে মানুষের অংগ- প্রত্যঙ্গ উড়ে যায় কিন্তু , বিশ্ব অবাক হয়ে তাকিয়ে রয় । মুসলিমরা জানে ন্যায়পরায়ণতা এর মূল্য কতখানি তাই তো হামাস যখন ইসরাইলি নারী জিম্মিদের মুক্ত দেয় তখন তাদের মুখ হাস্যজ্জ্বল ও শারীরিকভাবেও সুস্থ । পক্ষান্তরে , ফিলিস্তিনি জিম্মিরা ফেরে কংকালসার হয়ে । এই হলো তাদের ইনসাফের নমুনা । এরপরও , ইসলামকে হেয় করে পশ্চিমারা , আল্লাহকে মানতে নারাজ । ফিলিস্তিনিদের প্রতি জুলুমের বর্ণনা লিখতে শত পৃষ্ঠা লেগে যাবে তাও শেষ করা যাবে না ইহুদিদের অত্যাচারের ফিরিস্তি ।

কাশ্মীর

ভূস্বর্গ কাশ্মীর চেয়েছিল মুক্ত এক উপত্যকা কিন্তু আজ তা তিন টুকরো হয়ে একাংশ আছে চীনের কাছে ,একাংশ আছে পাকিস্তানের কাছে এবং একাংশ আছে ভারতের কাছে। ১৯৪৭ সালে শুরু হওয়া কাশ্মীর সংকট আজ ২০২৫ এসেও চলমান । জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালানো হয় এবং জাতিসংঘ গণভোটের মাধ্যমে প্রস্তাব দিলেও আজও তা তাদের ভাগ্য জোটেনি। এরপর মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরের উপর দখলদার ভারতের শাসন চলতে থাকে। ভারত কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ দখল করার পর থেকেই তারা কাশ্মীরের মানুষের উপর নিপীড়ন শুরু করে ।কাশ্মীরের মানুষদের জীবনের কালো অধ্যায় শুরু হয় অত্যাচারী রাজা হরি সিং ভারতের সাথে যুক্ত হবার পর থেকেই । ১৯৪৮ সালের ১০ই আগস্ট বৃটিশ দৈনিক পত্রিকা 'The London Times'-এ প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে জম্মুতে কমপক্ষে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার মুসলিমকে পরিকল্পিতভাবে গণহত্যা করা হয়।

২০১৯ সালে ভারতের কেন্দ্র সরকার কাশ্মীরের ঐতিহাসিক বিশেষ অধিকার বাতিল করে যা জনগণের মাঝে বিক্ষোভ, বরাবরের মতই গ্রেফতার, নিপীড়নকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে

।২০২২ এর শেষ দিক কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় আবারও কাশ্মীরের সশস্ত্র সংগঠনগুলি অভিযানে নিহত ও আহত হতে থাকে ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অনেকে। অধিকারীর হক নিশ্চিত হয় যখন সেখানে ইনসাফ বিদ্যমান থাকে। যে জাতির মাঝে তাকওয়া ও ইনসাফ বিদ্যমান, তারা সৌভাগ্যবান; পক্ষান্তরে হতভাগা তো সে জাতি, যারা ইনসাফ এর মূল্য বুঝে না। আজ পুরো বিশ্ব একটু ন্যায়বিচারের জন্য হাহাকার করছে কাশ্মীর এর ব্যতিক্রম নয়।

মিয়ানমার

মিয়ানমারের আরাকান বা রাখাইন রাজ্যে ২০১৬ ও ২০১৭ সাল থেকেই রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর জাতিগত নিধন, গণহত্যা ,ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ও বর্বরতা চলে আসছে।বাংলাদেশ প্রায় ১০ লাখের ওপর প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা মুসলিমকে ঠাই দেয়।মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য বিচারে ব্যবহারের জন্য যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করতে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল ২০১৮ সালে আইআইএমএম নামের একটি স্বাধীন তদন্ত কমিটি তৈরি করেছিল।তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুরো গ্রাম পুড়িয়ে ফেলা, বেসামরিক বাড়িঘরের ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে বোমা হামলা এবং বেসামরিক ও আটক যোদ্ধাদের গণহত্যা চালানো হচ্ছে।[69]
পশ্চিম আফ্রিকার ছোট্ট মুসলিম দেশ গাম্বিয়া আন্তর্জাতিক আদালত-আইসিজে' তে (ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস) মিয়ানমারের গণহত্যার জন্য মামলা দায়ের করেছিল যে সাহস প্রভাবশালী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দেখাতে পারেনি । ন্যায়বিচারের জন্য হাহাকার মায়ানমারবাসীর জন্য মুসলিম বিশ্বর নেতা চুপ ছিল যেমন , তারা কাশ্মীরী মুসলমানদের পক্ষে , ভারতের কট্টর হিন্দুবাদী সরকার কর্তৃক একের পর এক মুসলিম নির্যাতনের বিরুদ্ধে , ফিলিস্তীনী মুসলমানদের জন্য , উইঘুর মুসলমানদের বন্দীদশা নিয়ে চুপ আছে ।জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে মিয়ানমারের প্রায় ১ কোটি ৯৯ লাখ মানুষ, যা দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ, মানবিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে ৬.৪ মিলিয়ন শিশু রয়েছে।[70]

ভারত

বাংলাদেশের প্রতিবেশি দেশ ভারত । প্রতিনিয়ত তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুর প্রতি নির্যাতনের মিথ্যা গুজব রটাচ্ছে তাদের মিডিয়াগুলোতে কিন্তু ,তাদের অতীত ও বর্তমান মানুষের

[69] https://www.bbc.com/bengali/articles/cv2pl55400vo
[70] রয়েছে।https://www.unicef.org/myanmar/stories/six-things-watch-myanmar-2025?utm_source=chatgpt.com

প্রতি নির্যাতন এর ইতিহাস আমাদের কাছে তাদের মুখোশ খুলে দেয় । আজ তাদের দেশে মুসলিমদের প্রতি চলছে হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসন । বাবড়ি মসজিদ ভাঙ্গাসহ এখন পর্যন্ত অনেক মসজিদ তারা ভেঙ্গেছে । ভারত সরকারের মদদ থাকায় , হিন্দুগোষ্ঠী এ জন্য কাজ করার সাহস পায় । হিজাবী পড়ুয়া মেয়েদেরও হেনস্থা করা হয় । গরু চুরির অভিযোগ তুলে এক মুসলিমকে পিটিয়ে হত্যা করেছে উগ্রবাদী হিন্দুরা । আজ মুসলিমদের নাই ধর্মীয় স্বাধীনতা , বাকস্বাধীনতা ।এদিকে ,ভারতে ইনসাফ ও বৈধতার তকমা দিয়ে মুসলমানদের ধর্মীয় স্থাপনা ও অন্যান্য সম্পদ দখলের বন্দোবস্ত করার নিমিত্তে ওয়াকফ বিল পাশের পাঁয়তারা চলছে।ওয়াকফের মাধ্যমে ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বারা শুধু মুসলিমরাই উপকৃত হয়নি বা হচ্ছে না, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছে। ওয়াকফ এর কল্যাণে বহুকাল ধরেই মুসলিমদের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং জনহিতকর বহু কাজ হয়ে আসছে।নতুন এ বিলে ওয়াকফের মূলনীতিতে সংশোধনী এনে সেখানে মুসলিমদের সম্পত্তি এবং তাদের নিজস্ব বিষয়ে অমুসলিমদের দখলদারিত্বের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক দেশ বলা সেই ভারত আজ নিজেই সংখ্যালঘুদের সাথে ন্যায়বিচার নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

বাংলাদেশ

২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লব বাংলাদেশের সামনে আওয়ামী লিগ সরকার প্রধান শেখ হাসিনার ১৬ বছর ধরে যে জুলুম নির্যাতনের অবস্থার প্রকাশ করে দেয় । একে তো জুলাইয়ের গণহত্যা , তার মধ্য বিডিয়ার বিদ্রোহ হত্যাকান্ড , শাপলা চত্বরের হুজুরদের হত্যা , ঘুম-খুন , আয়নাঘর কি নেই তার বিরুদ্ধে আনিত অপরাধের লিস্টে । আদালতে ঘুরে ঘুরে মানুষ হয়রান ন্যায়বিচারের আশায় ।সংবিধানে "ন্যায়বিচার" এর কথা বললেও বাস্তবের অস্তিত্ব নেই । এদিকে , আগে থেকেই বিতর্কিত ৫৪ ধারা নামক যুলুমের ধারাটিকে প্রত্যেক দলীয় সরকার তার সম্ভাব্য বিরোধীদের দমনে ব্যবহার করছে, যা মৌলিক মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘিত ধারার একটি। বিনা অপরাধে আজ অনেক আলেম জেলে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। কিন্তু , আইনের মারপ্যাঁচে তাদের এখনও জেলেই দিন কাটছে । মুসলিম প্রধান দেশে আজ মুসলিমরাই সংখ্যালঘু হয়ে গেছে।বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস আজ ভারী হয়ে আছে মযলূম মানবতার দীর্ঘশ্বাসে । ন্যায়বিচারের কথা বলে গণতন্ত্র আজ দিচ্ছে জুলুমের ছোয়া।

উপরোক্ত দেশগুলো এছাড়াও চীনে উইঘুর ,কসোভোতে অনেক বছর যাবত মুসলিমদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে। এমন করে কত মানুষ , কত পরিবার শেষ হয়েছে তার খবর কেউ জানে না । আজ , জীবিত থেকে কিছু মানুষ মৃত শুধুমাত্র ন্যায়বিচার না পাওয়ার ফলে । সেই তালিকা তৈরি করলে শত শত পৃষ্ঠা হয়ে যাবে। আধুনিক গণতন্ত্রের কথিত জনগণের **শাসনের স্বরূপ**

যখন এই; প্রশ্ন দাঁড়ায় যে , বর্তমান পুঁজিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থায় কি সত্যিকারের ইনছাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব? দুর্বলের অধিকার প্রতিষ্ঠা কি সত্যিকা্র অর্থে সম্ভব?

আমরা মুমিন মুসলিমরা বিশ্বাস করি ,আল্লাহ রব্বুল আলামীন এসব কাফের , জালেমদের জন্য রেখেছেন দুনিয়াতে লাঞ্ছনা ও আখিরাতে ভয়ানক শাস্তি যা তারা আস্বাদন করবেই আজ না হোক কাল । আর অপরদিকে ইনসাফকারী শাসকের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরষ্কার। কিন্তু , ইসলামের ন্যায়বিচারের যে চিত্র আমাদের সোনালী যুগের মানুষদের থেকে পাই , যে ইনসাফভিত্তিক বিচারবিভাগের বর্ণনা পাই তা কি এই আধুনিক যুগেও প্রয়োগ সম্ভব ? নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

আধুনিক সমাজে ইসলামি ন্যায়বিচারের প্রয়োগ

ইসলামে ন্যায়বিচারের প্রায়োগিক ক্ষেত্র যে কত ব্যাপক তা বলার অপেক্ষা রাখে না ।তবে ইসলামের শরীয়াহ আইন আধুনিক সমাজের মানুষের কাছে বড্ড সেকেলে ও মধ্যযুগীয়, যাতে অতীত যুগের ধ্যান-ধারণা বিদ্যমান এবং বর্তমান যুগের বাস্তবতার সাথে এর কোন সামঞ্জস্য নেই। এমনকি শরীয়াহ' র ধারণাকে ভুল ব্যাখ্যা, ভ্রান্তির শিকার ও অপব্যাখ্যা করা হয়। তাই, বর্তমান যুগের চাহিদা মেটাতে একে বাতিল, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে নতুন আইন ও বিধি রচনা করার ওপর জোর দেয়া হয়। ইসলামি বিদ্বেষীরা বিষয়টিকে আরো বেশি ঘোলাটে করে তুলে । নাস্তিকতার বিষ বাষ্প এত প্রগাঢ় হয়েছে যে , জন্মগতভাবে মুসলিম হয়েও আজ অনেকে আল্লাহ আইনকে কটাক্ষ করে যার ফলে বিধর্মীরা সুযোগের সৎব্যবহার করে । এরমানে , তারা তাল কে তিল করে তোলে । যেটা আসলে ন্যায়ভিত্তিক আইন, যা মানলে দেশ ও সমাজে কল্যাণ তাও তারা অযৌতিক যুক্তি তর্ক দিয়ে উপস্থাপন করে দেশবাসীর কাছে। কিন্তু, আজ চোখের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত “ আফগানিস্তান' ' । অল্প কয়েক বছরের মধ্য তারা শরীয়াহ আইন বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করছে। এরপর ,সিরিয়াতেও নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা হচ্ছে ।এছাড়া , আরো কিছু দেশেও শরিয়াহ আইন আংশিকভাবে তাদের পারিবারিক আইনে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আধুনিক সমাজে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের আসলে দুটি অসার শব্দ-বাক্যে । আমাদের মুক্তি পথের আশা দেখালেও কিছুই দিতে পারে না পশ্চিমা বিশ্ব । পারবে কিভাবে ;আমাদের শেকড় যে নিহিত আছে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ । তা বাদ দিলে তো বিশ্ব এমন অরাজকতার রাজ্য পরিণত হবেই।

আজ আধুনিক সমাজে ইসলামি খিলাফাত নাই এ কথা যেমন সত্য , তেমনি গণতন্ত্র এর ঝান্ডা দোলায়িত করেও যে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না এটাও চরম সত্য এবং দিনের আলোর মত পরিষ্কার । ইসলামি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এ সময়ে ভীষণ জরুরি কেননা বিশ্বে জুলুম-নির্যাতন এমন পর্যায় চলে গেছে যে একজন বিবেকবান মানুষ চুপ থাকতে পারেনা । আজ তাই মানুষ অধিকার আদায়ে রাস্তায় নামে , মিছিল করে । এমন কি সেখানেও তাদের বাকস্বাধীনতা রোধ করা হয়। অথচ , ইসলামের ন্যায়বিচারের যে মূল্যবোধ তা যদি ব্যক্তিগতভাবে , জাতিগতভাবে ও বৈশ্বিকভাবে ধারণ করা যায় তাহলে , এই জুলুম নিপীড়ন কমে আসবে অনায়াসে । তবে একটি বাস্তবতা মানতে হবে যে ,আধুনিক সমাজে ইসলামি ন্যায়বিচার প্রয়োগ করা যেতে পারে ধর্মীয় নীতিমালা ও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে ও ভারসাম্য রেখে । একথা মাথায় রাখা জরুরি যে , একদিনে কোন কিছু পরিবর্তন হয়ে যায় না । আমাদের আধুনিক সমাজে যে হারে ঘুণে ধরেছে তা ইসলামি ন্যায়বিচারকে সামনে রেখে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করতে হবে । তারই প্রেক্ষিতে আমাদের জন্য প্রয়োজন শাসনব্যবস্থা, বিচারপ্রক্রিয়া, সামাজিক নৈতিকতা ও ব্যক্তিগত আচরণে ইসলামি ন্যায়ের মূলনীতি

বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে যোগ্য ন্যায়পরায়ণ নেতা বাছাই ও জরুরি । সমাজের আইনের নীতি নির্ধারকরা যদি চরম পরিমাণে অত্যাচারী সুলুভ হয় তাহলে ন্যায়বিচার নিশ্চিত ফাটল ধরে । উদাহরনস্বরুপ বলা যায় , ভারতের হিন্দুত্ববাদী নেতা নরেন্দ্র মোদীর কথা , ইসরাইলের নেতা বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কথা। আধুনিক সমাজে ইসলামি ন্যায়বিচার প্রয়োগ মানে শুধু শরিয়া আইন চাপিয়ে দেওয়া নয়; বরং তা হলো মানবিকতা, সমতা, জবাবদিহিতা ও জনকল্যাণে কেন্দ্রভিত্তিক একটি জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলা।সহনশীলতা, জ্ঞান এবং বাস্তবতার আলোকে প্রয়োগ করা হলে, একটি আদর্শ সমাজ গঠনের ভিত্তি হতে পারে ইসলামি ন্যায়বিচার।Dennis Sarant তাঁর ‘History of Religion’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘ইসলাম আধুনিক বিশ্বে টিকে থাকতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এর মহান নীতিসমূহ সহজ ও যুক্তিপূর্ণ’ ।[71]

কিভাবে বা কোন পন্থায় আজ এই অস্থির আধুনিক সমাজে ইসলামি ন্যায়বিচারের প্রয়োগ করা যায় তা নিম্নক্ত কার্যকর উপায়গুলোর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো ঃ

১ । বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা

* ইসলামি বিচারব্যবস্থার ভিত্তি হলো - বিচারক ও প্রশাসকেরা হবে ন্যায়পরায়ণ, পক্ষপাতহীন ও নৈতিকভাবে দৃঢ় । এক্ষেত্রে তাকওয়া বা অন্তরে আল্লাহর ভীতি যদি বিচারকগণের মধ্য জাগ্রত করা যায় তাহলে ব্যক্তি হিসেবে সেই হবে সৎ, ন্যায়পরায়ণ । এর ফলে ইনসাফের সাথে সমাজে সকল বিচারগুলোর নিষ্পত্তি হবে আশা করা যায় । এজন্য , মুসলিম বিচারকদের ও দাঈদের মেহনত জরুরি ।

* আমাদের সমাজে প্রতিটি স্তরে দুর্নীতির বিষবাষ্প ছড়িয়ে আছে । এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না । দুর্নীতি রোধে কঠোর আইন ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন থাকা উচিত । ইসলামে ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া নিষিদ্ধ , আমানতের খিয়ানত করা হারাম । ইসলামে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চুরি, জালিয়াতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাতের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান রয়েছে।

যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে (সূরা আল-মায়েদা, ৫:৩৮)

এই বিধান আপাতদৃষ্টিতে কঠোর দেখালেও , এর প্রয়োগে কোন মানুষ দুর্নীতি করতে সাহস পাবে না ।

* আরেকটি যুগোপযোগী উদ্যোগ নেয়া যায় তা হলো ,বিকল্প বিচার ব্যবস্থা (Alternative Dispute Resolution), যেমন সালিশি ও শরিয়া ট্রাইবুনাল, নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ইসলামে বিচারব্যবস্থায় এমন বিশেষ ট্রাইবুনালের ব্যবস্থা করাকে উৎসাহ দেয় ।

---

[71] মোহাম্মদ তানভীর আহম্মেদ ও অন্যান্য ইসলামি অর্থনীতি, পৃ. ১৬।

* ইসলামে দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল এর নির্দেশ আছে । এতে বাদী- বিবাদীর মধ্য ইনসাফ করতে হবে ।
* ইসলামি যুগে জনগণ শাসক এর কাছে শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিতে পারতো । এটা আমাদের সমাজে প্রয়োগ খুবই জরুরি কেননা আজ রাষ্টপ্রধান সরকারের জবাবদিহিতা নেই বলে তারা যা খুশি তাই করতে পারে । রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতেও একই বিধান প্রয়োগ করতে হবে যাতে অন্যায় যেই করুক না কেন তাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে এতে ধীরে ধীরে সবস্তরে স্বচ্ছতা দেখা দিবে । জনগণ ও ন্যায়বিচার পাবে ।

২। শাসন ও আইন প্রণয়নে ইসলামী নীতির অন্তর্ভুক্তি

*সংবিধান ছাড়া একটি দেশ চলতে পারে না । সেই সংবিধানে ইসলামি নীতিকে অনুপ্রেরণা হিসেবে রাখা যেতে পারে, যেমন মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় দেখা যায়।

* সাম্য ও ন্যায়ের মূলনীতিকে ইসলাম সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় । আইনে প্রণয়নে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ওপর বেশি জোর দিতে হবে। বাস্তবে তা প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি জরুরি । এক্ষেত্রে , কুর আনের কিছু আয়াতকে যুক্ত করা যায় কেননা কুরআন সকল মানুষের জন্য নাযিল হয়েছে।
* ইসলাম মানবাধিকারকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয় ।আইন প্রণয়নে মানুষের মৌলিক অধিকার (জীবন, সম্পদ, ধর্ম, বিবেক, বংশ ও সম্মান) রক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

*ইসলামের শাস্তি আইনকে গুরুত্ব দেয়া

হুদুদ, কিসাস, তাযীর ইসলামী শারিয়াহর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে আধুনিক সমাজে ইসলামি শাস্তি আইন বাস্তবায়নের প্রশ্নে নানা দিক বিবেচনা করতে হয় – ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক, আইনগত ও মানবাধিকার সংক্রান্ত দিকগুলো। অনেকে মনে করে ইসলামের শাস্তি আইন কেবল শাস্তি দেওয়ার জন্য যা খুব কঠোর । কিন্তু সমাজে সুবিচার, নৈতিকতা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য এই আইন প্রণীত হয়েছে যা অপরাধ দমনে মনস্তাত্ত্বিক ভূমিকা রাখে। কিছুদিন আগেও , বাংলাদেশে ধর্ষণের মাত্রা এত বেড়েছিল যে , সাধারণ মানুষ ইসলামে ধর্ষণের বিধান কার্যকর করার কথা বলে। শাস্তি হিসেবে বিবাহিত ও অবিবাহিত ধর্ষকের জন্য যথাক্রমে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড ও একশ’ বেত্রাঘাতের সাথে একদল বিদ্বান মিছলে মোহর তথা উক্ত নারীর সামাজিক অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মোহর জরিমানা হিসাবে যুক্ত করেছেন ।[72]

[72] (আবূদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৫৭২; মুওয়াত্তা মালেক হা/১৪, ২/৭৩৪; আল-মুনতাকা শারহুল মুওয়াত্তা ৫/২৬৮-৬৯; ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিযকার ৭/১৪৬)।

এখন যদি সত্যিই কোন ধর্ষককে এসব শাস্তি দেয়া হয় তাও আবার প্রকাশ্য তাহলে যারা দেখবে শাস্তির জন্য তাদের মনে ভয় জন্মাবে এবং এমন অপরাধ করতে সাহস পাবে না। আমাদের সমাজে অপরাধের যে নমুনা তা ইসলামি শাস্তি আইন কার্যকর না করলে কমার সম্ভাবনা খুন ক্ষীণ । তবে এক্ষেত্রে আধুনিকে সমাজে এ শাস্তি আইন প্রয়োগে কিছু দিক বিবেচ্য যেমন ঃ ইসলামী শাস্তি আইন প্রয়োগের শর্তাবলি কঠোরভাবে মেনে চলা যেমন:হুদুদ শাস্তির জন্য অপরাধ প্রমাণে নির্ভরযোগ্য সাক্ষী বা অপরাধীর স্বীকারোক্তি আবশ্যক ,বিচারকের সুবিচার ও নিরপেক্ষতা বাধ্যতামূলক , আইন কার্যকর করার জন্য সমাজে:ন্যায়বিচারপূর্ণ বিচারব্যবস্থা,দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, নৈতিক শিক্ষার প্রচলন,অর্থনৈতিক সাম্য ইত্যাদি থাকতে হবে। এসব উপাদান ছাড়া কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করলে তা অবিচার বা দমননীতির চেহারা নিতে পারে।এজন্য ,ধাপে ধাপে প্রয়োগ ও সংস্কার করতে হবে। অতএব,আধুনিক সমাজে ইসলামী আইন প্রয়োগ করতে হলে: প্রথমে মানুষের মাঝে সচেতনতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগানো দরকার , আইনপ্রণয়ন ও বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে হবে। শরিয়াহর মৌলিক নীতির প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে, প্রয়োজনে আইনের দৃষ্টিকোণ ও পদ্ধতির কিছু বিষয় আধুনিক ভাষায় ব্যাখ্যা করে সংস্কারের সুযোগ রাখতে হবে । আরেকটি বিষয় হলো , ইসলামী শাস্তি আইনের প্রয়োগে মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়ের সঙ্গে সমন্বয় বা সংলাপ প্রয়োজন। ইসলাম ন্যায্যতা, দয়া ও মানবিক আচরণ এর গুরুত্ব অপরিসীম।

অনেক সময় ,কোন রাষ্ট্র যদি ধর্মনিরপেক্ষ আইন অনুসরণ করে, তবে ইসলামী শাস্তি আইনকে সরাসরি চাপিয়ে দেওয়া রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে করণীয় হলো ঃ মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিবাহ, উত্তরাধিকার ইত্যাদিতে শরিয়াহর প্রয়োগ) যা অনেক সেকুলার মুসলিম দেশগুলো করছে বা বিকল্প শালিশব্যবস্থার (alternative dispute resolution) মাধ্যমে শরিয়াহর নীতিগুলো স্বেচ্ছায় গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
ইসলামের শাস্তি আইন আধুনিক সমাজে বাস্তব প্রয়োগের আগে অবশ্যই প্রস্তুতি, শর্ত ও সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিচার করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে। সমাজ গঠন, নৈতিকতা, ন্যায়বিচার এবং মানবিকতাকে ইসলাম যে হারে গুরুত্ব দেয় সে বিবেচনায় বর্তমানে এর বিকল্প কিছুই নেই ।

৩. দারিদ্র্য হ্রাসকরণে অর্থব্যবস্থায় পরিবর্তন

স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত যে অর্থব্যবস্থায় মানুষকে দেয়া হয়েছে তা সৎ পথে জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য পথনির্দেশ করে। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর হাতে। মানুষ কেবলমাত্র তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে সম্পদের আমানতদার হিসেবে দুনিয়ায়

জীবনযাপন করে। এই অর্থব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল, সম্পদ উপার্জন, উৎপাদন ও ভোগে হারাম ও হালালের ব্যবধান নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক কেননা শুধু ইহকালীন লাভের জন্য বা ভোগ বিলাসে জন্য এই ব্যবস্থার স্রষ্টি হয়নি , পরকালীন জবাবদিহিতার মুখোমুখির বিষয় জড়িত। এ অর্থনীতি সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য কিছু ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে যেমন , যাকাত, ওশর, জিযিয়া ও ছাদাকাতুল ফিৎর , বায়তুল মাল , ওয়াকফ ইত্যাদি যা হালাল হিসেবে বিবেচিত। হারাম হিসেবে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সূদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, কালোবাজারী, অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন, চুরি, ডাকাতি, শোষণ, মজুদদারী, যুলুম ইত্যাদি।

অপরদিকে , প্রচলিত অর্থব্যবস্থা মানব রচিত হওয়ায় সময়ের আবর্তনে এ অর্থব্যবস্থা সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হয় ।বর্তমানে প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে(সম্পদই যেখানে মুল বিষয়) নৈতিক দিক উপেক্ষিত থাকে। ফলে, নিঃস্ব, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের ভোগের প্রাধান্য উপেক্ষিত হয়।সম্পদ উপার্জন, উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে যে বিধি-বিধানআছে তা ইনসাফবিহীন ফলে আর্থিক সমতার স্থলে হত-দরিদ্র, নিন্মমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং ধনী ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। যা একটি দেশের অর্থনীতির জন্য খুব বেশি কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম নয়। সকল অর্থ ব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য থাকে সমাজের দারিদ্র্য বিমোচন করা। কিন্তু, আজ ভিন্ন দৃশ্য দেখা যায়। সম্পদই আজ যেন মুখ্য, মানুষ নয়। আধুনিক অর্থনীতির দর্শনে নৈতিক মূল্যবোধ, সদাচরণ, বিত্তহীনদের বিষয় বরাবরই উপেক্ষিত । কিছু লোকের হাতে সম্পদ পুঙ্গীভূত করে সমাজে আয় বৈষম্য (Income inequality) সৃষ্টি করে আর, অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আকাঙক্ষা ক্রেতাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে।কিন্তু , ইসলামী অর্থনীতি এর বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বহন করে । ইহজগত ও পরজগতের দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিক কল্যাণের মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে ইসলামি অর্থনীতি।

এই যে, নৈতিকতা বিবর্জিত এবং ইনসাফহীন পুঁজিবাদ ব্যবস্থার বিষে জর্জরিত মানব সমাজ এবং মানবতাবিরোধী সমাজতন্ত্রের বিষবাষ্প যখন গোটা বিশেকে ছেয়ে ফেলেছে তখন বিশ্ব মানবের মনে প্রশ্ন জেগেছে- এখন বিকল্প কি আছে? অথচ বিকল্প তাদের সামনে যা, তারা দুনিয়ার মোহে পড়ে তারা দেখেও দেখে না।মানবতার শাশ্বত মুক্তির পয়গাম ইসলামের আলোকে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইনসাফের যে নীতি ও দৃষ্টান্ত আছে ইসলামী অর্থনীতিতে যা রাসূলে করীমের (স) মদীনার জীবন হতে শুরু করে আব্বাসীয় খিলাফত পরবর্তী যুগেও বিশ্বের এক বিশাল ভূখণ্ডে সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর ছিল তা এ বিশ্বের জন্য অনুকরনীয় হতে পারে। সে প্রেক্ষিতে নিম্নের উপায়গুলো এই আধুনিক সমাজেও কাজে লাগানো যেতে পারে ।

ক] কুরআনে স্পষ্ট বলা আছে , মাপে ওজনে কম না দিতে কিন্তু , আজ এ যেন খুব মামুলি বিষয় । সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ হওয়ায় দেখা যায় , মানুষ অনেক সময় বিক্রেতার এসব

অনৈতিক কাজ ভিডিও করে ফাঁস করে অথবা বাজারে মাঝে মাঝে মানুষ প্রতিবাদ করে কিন্তু , আইনানুগ ব্যবস্থার কার্যকরী পদক্ষেপ না থাকায় আজও এই কাজ মানুষ করে । ভোক্তা অধিকার থেকে কতৃপক্ষ এসে এর ব্যবস্থা নিলেও লাগামহীনভাবে এই অপরাধ বেড়েই যাচ্ছে। এর মূল কারণ মানুষের মাঝে তাকওয়া নেই । এক্ষেত্রে , উপযুক্ত হলো হাটে বাজারে কুরআনের বানী লিফলেট আকারে বিতড়ণ করা, কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে বাজার ব্যবস্থার দায়িত্ব দেয়া যাতে তিনি অপরাধীকে চিহ্নিত করে ন্যায্যভাবে আইনের মধ্যমে বিচার করার ব্যবস্থা করতে পারেন। মাঝে মাঝে সৎ ব্যবসায়ীদেরকে সরকারিভাবে পুরষ্কৃত করে সমাজের আরও ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করা যেতে পারে। এভাবে সমাজে অন্যান্যা শ্রেণিপেশার মানুষের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার বীজ বপন করতে হবে। নবীজির আদরর্শকে ছড়িয়ে দিতে ব্যবসায়ীদের নিয়ে আলোচনায় বসা। আশা করা যায় এইসব পদক্ষেপ নিলে ধীরে ধীরে মানুষের মাঝে ন্যায়পরায়ণবোধ জাগবে।

খ] ইসলামে যাকাত ও ওশর এমন সুনিপুণ খাত যার মাধ্যমে গরিব দুখীদের প্রয়োজন মিটে।আজ আমাদের সমাজে সুষ্ঠু ও ন্যায্যভাবে যাকাতের সম্পদ বন্টিত হলে কোন গরিব খুজে পাওয়া যেত না। বিশ্ব উন্নত হয়েছে ঠিকই কিন্তু , আজও দেয়ালে কান পাতলে দরিদ্রের কান্না শোনা যায় । এজন্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের এগিয়ে আসতে হবে। যাকাত এর পাশাপাশি সদকা ও ওয়াকফ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করে সমাজের দরিদ্র ও নিপীড়িতদের সহায়তা করা যেতে পারে । বাংলাদেশে আজ আস সুন্নাহ ফাউন্ডেশন এর নাম মানুষের মুখে মুখে । দারিদ্র বিমোচন এর কথা বলে গণতান্ত্রতিক সরকার । কিন্তু , তারা যাকাতের মত টুল কে উপেক্ষা করছে । আস সুন্নাহ ফাউন্ডেশন এর মত আর যে সব সেবামূলক সংগঠন বা সংস্থা আছে সরকারিভাবে তাদের স্বীকৃতি দিয়ে যাকাত আদায় ও প্রদানের দায়ীত্ব সংস্থার ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে দিলে নায্যভাবে যাকাত, ওশর বন্টিত হবে আশা করা যায়।
গ] ওয়াকফ ব্যবস্থাকে ভালোভাবে মূল্যায়ন করা । যোগ্য ব্যক্তিকে এর তত্ত্বাবধায়নের দায়ীত্ব দেয়া যেন , ওয়াকফকৃত সম্পদ ইনসাফের সাথে বন্টিত হয়।

ঘ) ইসলামে সুদ হারাম এটা সমাজে প্রায় সকল মানুষই জানে ।কিন্তু , আজ ব্যাংকিং সিস্টেমের অবস্থা এমন মানুষ জেনে না জেনে এর ফাঁদে পা দেয় । এর ফলস্বরূপ , পুঁজিপতিরা লাভবান হয় আর দরিদ্ররা সেই দরিদ্রই থেকে যায় । এক্ষেত্রে করণীয় হলো , সমাজে ইসলামের কর্জে হাসানা নীতির প্রয়োগ ও মুদারাবা পদ্ধতি এর প্রয়োগ । ভারত ও শ্রীলংকায় মসজিদভিত্তিক কর্জে হাসানা সোসাইটিভিত্তিক মুদারাবা পদ্ধতি চালু আছে। কর্জে হাসানা হলো একটি বিনামূল্যে ঋণ যা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের প্রদান করা হয়। সেই সময় শেষে, ঋণের মুখ্য মূল্য পরিশোধ করতে হবে।আর , মুদারাবা এমন এক ব্যবসায়িক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, যাতে একপক্ষ মূলধন জোগান দেবে এবং অন্যপক্ষ তার দক্ষতা, শ্রম ও প্রচেষ্টা

কাজে লাগিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করবে। বিত্তহীন ও দক্ষ লোকদের কর্ম সংস্থান এর ব্যবস্থা করতে পারে। দরিদ্র গ্রামীণ নারী ঘরে বসে আয়ের ব্যবস্থা করতে পারে যদি সে কর্জে হাসানার সুবিধা পায় । এজন্য , সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে আহ্ববান জানাতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে ইসলামী অর্থনীতিকে সবার জন্য অন্তর্ভুক্ত করলে শিক্ষার্থীরা ইসলামের ইনসাফভিত্তিক অর্থব্যবস্থার কথা জানতে পারবে।

#সরকারি বা বেসরকারি “ইসলামি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্কিম” চালু করে দরিদ্রতা, শিক্ষার অভাব ও চিকিৎসা সংকট দূর করা।

শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামি মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্তি

ব্যক্তি ও জাতির উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমাগত উদ্ভাবনী ধারণা, প্রযুক্তি ও বাস্তবমুখী পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে এগিয়ে চলেছে গোতা বিশ্ব । একে সাফল্যর চোখে দেখে মানুষ । উচ্চশিক্ষার জনইয় বিসেশ পারি দেয়া তো অনেকের স্বপ্ন ।বাবা মা কি যে গর্ববোধ করেন তার সন্তানের জনইয় তো সবার জানা। কিন্তু , এত উচ্চ ডীগ্রিধাড়ি মানুষ বাড়ছে তাহলে আজ সমাকজে নৈতিক অবক্ষয়ের দ্বার প্রান্তে কেন মানব সমাজ । আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কি ইনসাফভিত্তিক? প্রতিটি মানুষের শিক্ষার অদ্ধিকার কি দেয়া হচ্ছে? সবাই তার হক কি রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে বুঝে পাচ্ছে? বিশ্বব্যাপী ৪০ শতাংশ মানুষ এমন একটি ভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছেন না যা তারা সাবলীলভাবে বোঝেন ও কথা বলেন। কিছু নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশে এই সংখ্যা ৯০ শতাংশ পর্যন্ত, যা বিশ্বব্যাপী ২৫০ মিলিয়নেরও বেশি শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ইউনেস্কোর গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং (GEM) দলের প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য উঠে এসেছে।বিশ্বে ৪০ শতাংশ মানুষ মাতৃভাষায় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, জানাল ইউনেস্কো ,Daily Inqilab ,০৪ মার্চ ২০২৫,
পুঁজিবাদী বিশ্ব আজ নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ধবংসের কবলে । এর মূল কারণ , শিক্ষাব্যবস্থা মানূক্ষে নৈতিক মূল্যবোধ শিখাতে ব্যর্থ । একদিকে মানুষ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত অন্যদিকে মানুষ ধর্মীয় মুল্যবোধ অন্তরে লালাওনে ব্যর্থ ।বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা কি যে নাজেহাল অবস্থা তা তো আমাদের দেশের নতুন নতুন সনহশোধিত পাঠ্যপুস্তক দেখলেই বোঝা যায় । শরীফ শ্রীফার কাহিনী তো লোক্মুখে । এর প্রতিবাদ করার জুলুমের শিকার হন শিক্ষকব্রন্দ । এ কেমন অরাজকতা । যে শিক্ষা ব্যবস্থা বাক্স্বাধ্বীওতা শিখায়া তারাই আবার , শিক্ষক ন্যায় এর কথা বললে তার টুটি চেপে ধরে , জেলে পুড়ে। এ যেন মগের মুলুক । ইচ্ছা করে ইওসলামি বইয়ের পাতায় নানা প্রানির ছবি ছাপা হয় , টড়ান্সজেন্ডার এর মত ধ্রন্য মতবাদ কোমলমতি শিশুদের বুঝানো হয় । এইযে একধরনের জুলুম চলছে এর থেকে বাচার উপায় কি । নিম্নে , শিক্ষাক্ষেত্রে কিভাবে ইনসাদ কায়েম করা যায় তার উপায় তুলে ধরা হোল

ক] বেশি বেশি মানসম্মত মক্তব প্রতিষ্ঠা করা । যেখানে শিশুরা ধর্মী শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা ও পাবে । হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ গাযালি রহ. (২) তার অতি মূল্যবান গ্রন্থ 'ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন'-এ بيان الطريق في رياضة الصبيان في (أول نشوئهم ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم শিশুদের প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি এবং তাদের শিষ্টাচার ও চরিত্র গঠনের উপায়) শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, জেনে রাখো, শিশুদের প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। শিশুরা তাদের মা-বাবার কাছে আমানত। তাদের অন্তর স্বচ্ছ নির্মল মুক্তোর মতো, তাতে কোনো দাগ নেই, কোনো চিহ্ন নেই। তাদের অন্তরে যা অঙ্কন করা হবে তারই জন্য প্রস্তুত। তাদের অন্তরকে যেদিকে ঝোঁকানো হবে সেদিকেই ঝুঁকবে। তাদের যদি যা-কিছু ভালো তার ওপর অভ্যস্ত করে তোলা হয় এবং ভালো শিক্ষা দেওয়া হয়, তারা তারই ওপর বেড়ে উঠবে। এতে দুনিয়াতেও সৌভাগ্যবান হবে, আখিরাতেও হবে। তাদের সওয়াবের অংশীদার যেমন তাদের মা-বাবারা হবে, তেমনই তাদের প্রত্যেক শিক্ষক ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারীও অংশীদার হবে। কিন্তু তাদের মন্দের ওপর অভ্যস্ত করে তোলা হলে এবং জন্তুজানোয়ারের মতো অবহেলা দেখানো হলে তারা দুর্ভাগ্যের শিকার হবে এবং ধ্বংস হবে। এই পাপ তাদের অভিভাবক ও দায়িত্বশীল সবাইকে বহন করতে হবে।
[73]

অতএব , বলা যায় , শিশুদের নৈতিক শিক্ষা দিতে পারলে তাদের মাঝে হতে থেকে ইনসাফের বীজ বপন হবে ফলে বড় হলে সে নিজে একজন ন্যায়পরায়ন মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে পারবে আর এতেই শিখা সার্থকতা আসবে।

খ]   আধুনিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে বয়সভেদে ন্যায়, সততা, পারস্পরিক সম্মান ও মানবিকতা বিষয়ে ইসলামি নীতির আলোকে পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা। শুধু তা পাঠদানেই সীমাবদ্ধ না রেখে প্রাক্টিকালি বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে শেখানো যায় ।

গ]যারা উচ্চতর গবেষনা করততে চায় ইসলামি আইন ও ফিকাহ বিষয়ে গবেষণার সুযোগ বাড়ানো, যেন আধুনিক বাস্তবতায় শরিয়া সম্মত সমাধান খোঁজা যায়।

নারী ও সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষায় ভারসাম্য

* ইসলাম নারীদের সম্মান , মর্যাদা দেয়ার পাশাপাশি শিক্ষা, সম্পত্তি, বিবাহ ও উত্তরাধিকারে ন্যায্য অধিকার দিয়েছে।কিন্তু , নারীবাদের প্রচারণায় ইসলামের প্রকৃত নারী-অধিকার গুলো সমাজে ভুলভাবে উপস্থাপিত করা হয় । এসব বিভ্রান্তি দূর করে কোরআন ও হাদীস-ভিত্তিক

[73] ইমাম গাযালি, ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, খ. ৩. পৃ. ৭

নীতিকে সামনে আনা খুব প্রয়োজন।আধুনিক সমাজে এগুলোর সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে নিচের পদক্ষেপগুলো নেয়া যাতে পারে।

** নিজেদের পারিবারিক জীবনে আমাদের ইসলামি ন্যায়বিচারের মূলনীতি বাস্তবায়ণ করতে হবে। ঘরে ঘরে যেন নারীরা আমাদের হাতে নিগৃহীত না হয়। মা ও বোন, স্ত্রী ও কন্যা হিসাবে তারা যেন কোরআন ও সুন্নাহর প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা পায় সেটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে ।

* জুমুআর খোতবায়, ঘরোয়া আলোচনায় , পত্র-পত্রিকা ও বইপত্রের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা দরকার ।আমাদের তরুণ আলেমরা এ বিষয়ে সমাজের মানুষকে সচেতন করতে পারেন। নারীর শিক্ষা, ইসলামি স্কলারদের অংশগ্রহণ, এবং নারীদের ধর্মীয় জ্ঞানে সক্ষমতা বাড়াতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

* নারীরা যেন তাদের অধিকার নিজে জানে এবং প্রয়োগ করতে পারে, সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

* একটি সুদূরপ্রসারী ও বৈপ্লবিক চিন্তা হিসেবে মোহরব্যাংক বা নারীব্যাংকজাতীয় মডেল দাঁড় করানো যেতে পারে। যারা পর্দা করে ঘরে বসে ব্যবসায় করতে চায় তাদের জন্য করজে হাসানার ব্যবস্থা করা।

* সমাজে আজ ব্যভিচার , পরকীয়া প্রচুর বেড়েছে । এজন্য , ইসলাম নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে হারাম করে বিয়েকে হালাল করেছে। এজন্য , নারীদের জন্য আলাদা কর্ম সংস্থান এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে , আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করা যেতে পারে । এক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের পর্দা রক্ষা পাবে যেমন তেমনি , অন্যান্য নারীরা সুরক্ষিতভাবে এসব ক্ষেত্রে তাদের অধিকার ভোগ করতে পারবে।

* নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইনে পরিবর্তন আনা যেতে পারে । ইসলামী শাস্তি আইনে , উত্তরাধিকার আইনের বিধানকে সামনে রেখে নতুন আইনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ইসলামী নীতির ভিত্তিতে নারীর অধিকারকে আধুনিক আইনের ভাষায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। পারিবারিক আইন (বিবাহ, তালাক, খোরপোষ, উত্তরাধিকার)– এসব ক্ষেত্রে শরিয়াহ সম্মত ও ন্যায্য আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা।

* নারীকে বিয়েতে সম্মতি দেওয়ার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে ইসলামে । তাই জোরপূর্বক কোন অভিবাবক যেন এই কাজটি করতে না পারে তাই প্রথমে তাকে বুঝানো ইসলামে নারীর প্রতি ইনসাফের কথা । এতে কাজ না হলে সালিশ এর ব্যবস্থা করা। ইসলামের নারীনীতি ন্যায্য এবং নৈতিক ভিত্তিসম্পন্ন। আধুনিক সমাজে এই নীতিকে সফলভাবে প্রয়োগ করতে হলে: ধর্মের আসল রূপরেখা সমাজের নারীদের জানাতে হবে ,সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি দূর করতে হবে, আইনি ও শিক্ষাগত কাঠামোতে এ নীতিকে রূপ দিতে হবে।

* ইসলামি ন্যায়বিচারে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষাও গুরুত্ব পায় । আমাদের সমাজে এজন্য বেশি বেশি ইসলামের সংখ্যা লঘুদের অধিকার নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে হবে।

সুশাসন ও নৈতিক নেতৃত্ব গঠন

আজও মানুষ স্মরণ করে হজরত ওমর (রা.)-এর শাসন আমলকে। ইসলামি ন্যায়বিচারের অনুকরণীয় উদাহরণ — স্বচ্ছতা, আত্ম-জবাবদিহিতা ও জনকল্যাণ সেখানে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেত। কিন্তু, আজকের সমাজে উলটা চিত্র দেখা যায় । ইসলাম সুশাসন ও নৈতিক নেতৃত্ব গঠন এ যে মূলনীতি আমাদের দিয়েছে তা যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহলে একটি সুন্দর সমাজ আমরা পাব।

* আজকের রাজনীতিবিদ, প্রশাসক ও সমাজপতিদের মধ্যে নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা কঠোরভাবে করতে হবে
* তাদের মাঝে ইসলামের তাকওয়ার গুণকে উপস্থাপন করতে হবে।
*মাঝে মাঝে দেশব্যাপী সিরাত মাহফিলের আয়োজন করা যেতে পারে। যার ফলে ইসলামের ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ মানুষের মাঝে গড়ে উঠে।
*ইসলামি ন্যায়বিচারের গুরুত্বকে প্রচার করে তরুণ সমাজকে এ কাফেলায় আহ্ববান জানাতে হবে।

আধুনিক যুগের শরীয়াহভিত্তিক দেশ

সিরিয়া

২০২৫ সালের ১৩ই মার্চ সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রেসিডেন্ট আহমাদ আল-শারা অস্থায়ী সংবিধানের খসড়ায় স্বাক্ষর করেছেন যার মাধ্যমে এখন থেকে শরীআহ বা ইসলামী আইন মেনেই পরিচালিত হবে সিরিয়া।দেশের পুরনো সংবিধান বাতিল করে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য সাত সদস্যের একটি কমিটিও গঠন করা হয়।কমিটির সদস্য আব্দুল হামীদ আল-আওয়াক জানান, নতুন সংবিধানে রাষ্ট্রপ্রধানকে বাধ্যতামূলকভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হ' তে হবে এবং আগামী পাঁচ বছর দেশ পরিচালিত হবে ইসলামী আইন মোতাবেক। [74]

আফগানিস্তান

আফগানিস্তানের বর্তমান শাসক তালেবানের প্রধান নেতা শেখ হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা বলেছেন, তাদের দেশে শরিয়া আইন কার্যকরে কোনো 'নম্রতা' দেখানো যাবে না। কয়েক শতক পর আফগানিস্তানের রাজনীতি এখন ইসলামিক ব্যক্তিত্বদের হাতে এসেছে। তিনি এ বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্বের সঙ্গে নিতে বলেন।আফগান সরকারের উপমুখপাত্র হামিদুল্লাহ ফিতরাত বলেন, "বৈঠকে আমির উল-মুমিনিন হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা বলেছেন, শরিয়া কার্যকরের সময় কোনো ধরনের নম্রতা দেখাবেন না। শরিয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। অহংকার, বিভেদ এবং অবিশ্বাস এড়িয়ে চলুন। কোনো কিছু নিয়ে অবহেলা করবেন না। অবহেলা করার কোনো অজুহাত নেই। অপ্রয়োজনীয় জিনিসে আপনাদের সময় ব্যয় করবেন না। শত্রুর মিথ্যা প্রচারণায় প্রতারিত হবেন না। কারণ শত্রুরা মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। " [75]

জমি দখল প্রতিরোধ ও পুনরুদ্ধারে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে ইমারাতে ইসলামীয়া । এই লক্ষ্যে নতুন একটি মন্ত্রনালয় গঠন করেছে দেশটির বিচার মন্ত্রণালয়। নতুন এই মন্ত্রনালয়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'ভূমি ও দখলকৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার [76]

তালেবান নেতারা তাদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে রক্ষা করে যুক্তি দেখিয়েছেন, এটি ইসলামি শরিয়া আইনের ব্যাখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।দোষী সাব্যস্ত হওয়া তিন খুনির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। এ নিয়ে তালেবান ক্ষমতায় ফিরে আসার পর প্রকাশ্যে মোট নয় জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো। আফগানিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।দেশটিতে

---

[74] https://at-tahreek.com/article_details/920832

[75] শরিয়া কার্যকরে 'নম্রতা' নয়, আফগান প্রধান নেতার নির্দেশ , কালের দিগন্ত ডেস্ক : প্রকাশিত: রবিবার, ৪ মে ২০২৫

[76] মন্ত্রণালয়।' https://insaf24.com/news/12/05/2025/214309

চুরি, ব্যভিচার এবং মদ্যপানসহ অন্যান্য অপরাধের জন্য শাস্তি হিসেবে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হয়ে থাকে।[77]

সোমালিয়া

সোমালিয়া একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হলেও রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক প্রশাসনিক ভিন্নতা থাকায় শরীয়াহর প্রয়োগেও পার্থক্য দেখা যায়।শরীয়াহ আইন প্রধানত পারিবারিক আইন (বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, ভরণপোষণ ইত্যাদি) এবং কিছু ক্ষেত্রে ফৌজদারি ও বাণিজ্যিক আইনেও প্রয়োগ হয়।বিশেষ করে গ্রামীণ ও আধা-নগর অঞ্চলে শরীয়াহ আদালত বা স্থানীয় কাদির (ধর্মীয় বিচারক) দ্বারা পরিচালিত বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত। ইসলামী কট্টরপন্থী গোষ্ঠীর শাসিত এলাকায় (যেমন আল-শাবাব) সেখানে শরীয়াহ আইনের খুব কঠোর এবং রক্ষণশীল ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা হয়, যেমন:
চুরি করলে হাত কাটা ,ব্যভিচারে রজম (পাথর ছুড়ে মারা) ,অমুসলিম বা ধর্মান্তরিতদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তি। তবে, এখানে উল্লেখ্য যে , সোমালিয়ারা এখন মানব রচিত আইনের চেয়ে শাবাবের শরীয়াহ কোর্টে যেতে বেশি আগ্রহী কারন , তারা সেখানে ন্যায়বিচার পায় ও কোন ফি নেয়া হয় না। এমন ইনসাফের জন্য তারা এখন শরীয়াহ কোর্ট মুখী হয়েছেন।

[77] https://www.jagonews24.com/international/news/1014012

আশার বানী

মাহদী অর্থ ‘হেদায়াত-প্রাপ্ত।পারিভাষিক অর্থ ‘ইমাম মাহদী মানে হলো ‘আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত-প্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান’ । কিয়ামতের পূর্বে ‘ইমাম মাহদী’ র আবির্ভাবের বিষয়টি বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এটিকে কিয়ামতের আলামত হিসেবে অনেকেই উল্লেখ করেনি ইমাম আবু হানিফা তাদের একজন । তবে , কোনো কোনো হাদীসে বিষয়টিকে শেষ জমানায় ঈসা মাসীহের অবতরণ ও দাজ্জালের সাথে সংশিস্নষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে।যদিও মাহদীর কথা উল্লেখ করে কোনো হাদীস সহীহ বুখারী বা সহীহ মুসলিমে নেই তবে, অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়ক হাদীসগুলো সংকলিত। এ বিষয়ে যেমন কিছু সহীহ হাদীস আছে আবার কিছু যয়ীফ হাদীস বিদ্যমান এবং অগণিত জাল হাদীসও প্রচারিত হয়েছে। তবে এসবের মধ্য কয়েকটি গ্রহণযোগ্য হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّى أو مِنْ أَهْلِ بَيْتِى)يَمْلِكَ الْعَرَبَ/ يلي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى (يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِى وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِى يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا.

‘দুনিয়ার যদি একটি দিনও বাকি থাকে তবে আল্লাহ সে দিনটিকে দীর্ঘায়িত করে আমার বংশধর থেকে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন যার নাম ও পিতার নাম আমার নাম ও আমার পিতার নামের মতই হবে তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করবেন, আরবদের উপর রাজত্ব গ্রহণ করবেন জুলুম পূর্ণ পৃথিবীকে ইনসাফে পূর্ণ করবেন।[78]

আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

الْمَهْدِىُّ مِنِّى أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الأَنْفِ يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ

‘মাহদী আমার (বংশধর) থেকে, তার কপাল চুলমুক্ত (মাথার সম্মুখভাগে চুল থাকবে না) এবং নাক চিকন। সে অত্যাচারে পরিপূর্ণ দুনিয়াকে ন্যায়পরায়ণতায় পূর্ণ করবে। সে সাত (অন্য বর্ণনায়: নয়) বছর রাজত্ব করবে।[79]

উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

[78] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৫০৫, নং ২২৩০, ২২৩১। হাদীসটি সহীহ।

[79] ‘ হাদীসটি সহীহ। আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/১৭৪ (নং ৪২৮৭)। ইবনুল কাইয়িম, সুয়ূতী ও আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বা হাসান বলেছেন।

يَكُونُ اخْتِلاَفٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِى النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ -صلى الله عليه وسلم- وَيُلْقِى الإِسْلاَمُ بِجِرَانِهِ إِلَى الأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ/ تِسْعَ سِنِينَ، ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ

‘ ‘একজন খলীফার মৃত্যুর সময় মতভেদ হবে। তখন মদীনার একজন মানুষ পালিয়ে মক্কায় চলে আসবে। তখন মক্কার কিছু মানুষ তার কাছে এসে তাকে বের করে আনবে। তার অনিচ্ছা ও অপছন্দ সত্ত্বেও তারা হাজার আসওয়াদ ও মাকাম ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে তার বাইয়াত করবে। সিরিয়া থেকে একটি বাহিনী তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হবে। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী বাইদা নামক স্থানে এ বাহিনী ভূমিধ্বসে ধ্বংস হবে। যখন মানুষেরা তা দেখবে তখন সিরিয়া থেকে আবদালগণ এবং ইরাক থেকে দলেদলে মানুষ এসে হাজার আসওয়াদ ও মাকাম ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। এরপর কুরাইশ বংশ থেকে একব্যক্তি তার (মাহদীর) বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, যার মাতুল হবে কালব বংশের। এ ব্যক্তি একটি বাহিনী তার (মাহদীর) বিরুদ্ধে প্রেরণ করবে। কিন্তু মাহদীর বাহিনী কালব গোত্রের বাহিনীকে পরাজিত করবে। কালব গোত্রের গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) বণ্টনে যে উপস্থিত থাকবে না সে দুর্ভাগা। তখন সে (মাহদী) সম্পদ বণ্টন করবে এবং মানুষদের মধ্যে তাদের নবীর (ﷺ) সুন্নাত অনুসারে কর্ম করবে। আর পৃথিবীর বুকে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। সে সাত (অন্য বর্ণনায়: নয়) বৎসর এভাবে থাকবে। এরপর সে মৃত্যুবরণ করবে এবং মুসলিমগণ তার সালাতুল জানাযা আদায় করবে।’ হাদীসটির বিশুদ্ধতার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ মতভেদ করেছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে হাসান এবং সহীহ পর্যায়ের বলে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে শাইখ আলবানী হাদীসটিকে যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন। [80]

চতুর্থ হাদীস: আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ إِنْ قُصِرَ فَسَبْعٌ وَإِلَّا فَتِسْعٌ فَتَنْعَمُ فِيهِ أُمَّتِي نِعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوا مِثْلَهَا قَطُّ تُؤْتَى أُكُلَهَا وَلَا تَدَّخِرُ مِنْهُمْ شَيْئًا وَالْمَالُ يَوْمَئِذٍ كُدُوسٌ فَيَقُومُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا مَهْدِيُّ أَعْطِنِي فَيَقُولُ خُذْ

[80] ইবনুল কাইয়িম, আল-মানারুল মুনীফ, পৃষ্ঠা ১৪১-১৪৮; আলবানী, যায়ীফাহ ৪/৪৩৫-৪৩৭, নং ১৯৬৫এ

আমার উম্মাতের মধ্যে মাহদী আসবে। কম হলে সাত (বছর), না হলে নয় (বছর)। তখন আমার উম্মাতের মধ্যে নিয়ামত সর্বজনীন হবে। তারা এমনভবে প্রাচুর্য ও নিয়ামত ভোগ করবে যা তারা ইতোপূর্বে কখনোই ভোগ করে নি। উম্মাতকে সকল প্রাচুর্য দেওয়া হবে এবং মাহদী তাদেরকে না দিয়ে কিছুই সঞ্চিত করে রাখবে না। তখন সম্পদ হবে অফুরন্ত। কোনো ব্যক্তি যদি বলে, হে মাহদী, আমাকে প্রদান করুন তবে মাহদী বলবে: তুমি নিয়ে যাও। [81]

আজ জুলুম ভরা পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নাই । অন্যক হক নষ্টকারী দেদারসে জমীনে হাসিখুশিভাবে ঘুরে বেড়ায় । মানবতা , হয়া ,মমতা সজ্জিছুর বড় অভাব। কিন্তু , একজন মুমিন কখনও হতাশ হতে পারে না । উপরোক্ত হাদিসগুলো , নবীজি আমাদের যে আশার বানী শুনিয়ে গেছেন তাকে মনেপ্রানে বিশ্বাস করতে হবে। ইওমাম মাহদী রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করে বিশ্বে প্রাচুর্য, শান্তি, ইনসাফ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করবে আমরা সেই দিনের স্বপন দেখি।

[81] হাদীসটি হাসান।ইবনুল কাইয়িম, আল-মানারুল মুনীফ, পৃষ্ঠা ১৪১-১৪৮; আলবানী, যায়ীফাহ ৪/৪৩৫-৪৩৭, নং ১৯৬৫

মুসলিম উম্মাহর করণীয়

আমরা মুমিনরা বিশ্বাস করি যে ,নবীজির প্রতিটি কথা সত্য । তাই , ইমাম মাহাদী আসবে এটিও আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি । কিন্তু , আমাদের জানা নেই কবে আমরা ইমাম মাহাদীর সময়কার সেই ইনসাফপূর্ণ পৃথিবী পাব । তাই আমাদের ন্যায়ের প্রদীপ জ্বালাতে মুসলিম উম্মাহকে এক হতে হবে । আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে , আমরা ন্যায়পরায়ণ নেতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মাত । জুলুমে ভরা এই আধুনিক সমাজে কি করে ন্যায়বিচারের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা যায় সে পদক্ষেপগুলো তুলে ধরা হলো ঃ

১। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও একত্ব প্রতিষ্ঠা করা

আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন। আল্লাহ তা'য়ালাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে মেনে নেয়া ছাড়া সমাজে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রধান ভিত্তিই ছিল আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য গোটা মুসলিম উম্মাহকে ইসলামি খিলাফাত বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নিজের জান- মাল যা আছে সবদিয়ে হলেও এগিয়ে আসার মনোবল অর্জন করতে হবে।

২। দাওয়াতি মেহনত

আমাদের বিশ্বে এখনও অনেক অমুসলিম আছে যারা আজও ইসলামকে চিনতে পারেনি । শুধু তাই নয় অনেক মুসলিমকেও আজকের ফিতনার এ সময়ে ইসলাহ করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে । মানুষ ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পাশাপাশি ইসলামের ন্যায়বিচারের গুরুত্ব বোঝাতে হবে। উম্মাহর পুরুষকে নিজের ব্যক্তিজীবনের বাইরেও আল্লাহর রাস্তায় সময় দেয়ার জন্য সময় বের করতে হবে। আর , উম্মাহর নারীদেরকে সালাউদ্দিন আইয়ুবী , উমর রাঃ এর মত বীর সন্তান জন্ম দেয়ার ও লালন পালন করার দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে।

৩। আল্লাহ বলেন,
وَلۡتَكُنۡ مِّنۡكُمۡ اُمَّةٌ يَّدۡعُوۡنَ اِلَى الۡخَيۡرِ وَيَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ‌ؕ وَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ
তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে বাধা দেবে। এরূপ লোকই সফলতা লাভকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৪)

আমরা সাধ্যমত ইসলামের ন্যায়বিচারের প্রচারের পাশাপাশি সমাজে যদি কোন অন্যায় হতে দেখি তাহলে মানুষকে সাধ্যমত বাধা দিব। ভয়ে মুখ লুকিয়ে চলে আসবো না । মুমিন এক আল্লাহ ছাড়া কাউকেই ভয় পাবেনা। তাই অন্তরে "আমর বিল মা 'রূফ ও নাহী 'আনিল মুনকার" কে ধারণ করবো কারণ এটা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

৪। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার (রাহঃ) .... আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছিঃ যখন তোমাদের কেউ কোন অন্যায় দেখতে পায়, তখন সে যেন তা নিজ হাতে প্রতিহত করে। যদি ততটুকু শক্তি তার না থাকে, তবে সে যেন মুখে তা দূর করতে তৎপর হয়। যদি এই শক্তিও তার না থাকে, তবে সে যেন উক্ত মন্দ কাজকে মনে মনে ঘৃণা করে। আর এ হলো ঈমানের নিম্নতম পর্যায়। সুনানে নাসায়ী ,হাদিস নং ৫০০৮

উক্ত হাদিস , একজন মুমিনকে অন্যায় দেখলে প্রতিহত করার শিক্ষা দেয়।
আমরা অনেক সময় , পথে গরিবের ওপর অন্যায় হতে দেখি ।তখন একজন মুমিন মুসলিম হয়ে আমাদের যথাসম্ভব চেষ্টা করা এর প্রতিবাদ করা । এক্ষেত্রে , অন্যদের উচিত সমর্থন করা। প্রতিবাদকারী যেহেতু ঈমানী দায়িত্ব পালন করছে তাই তার সমালোচনা ও বিরোধিতা না করে অন্যদের কর্তব্য তার সমর্থন করা।হাদিস অনুসারে, অন্যায়-অপরাধের প্রতি অন্তরে ঘৃণা পোষণ করাও ঈমানের দাবি। যার অন্তরে সে ঘৃণা নেই তার উচিত নিজ ঈমানের ব্যাপারে সতর্ক ও সচেতন হওয়া।
৫ । বয়কট ও বানিজ্যচুক্তি বাতিল

আরব ও ইসলামি বিশ্বে বয়কট নতুন কোন বিষয় না । কিন্তু,বয়কটকে অনেকে হালকাভাবে নেয় ।বয়কটের উদ্দেশ্য হলো চিহ্নিত দেশ, সংগঠন বা ব্যক্তির আর্থিক ক্ষতিসাধন করা বা নৈতিক ক্ষোভ প্রকাশ করা যাতে বর্জনের লক্ষ্যবস্তু তার আপত্তিকর কার্যক্রম থেকে বিরত থাকে।ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলার দরুণ বিশ্বব্যাপী ইসরাঈলি পণ্য বয়কটের ডাক দেয় নানা দেশের জনগণ ।বয়কটের মুখে পড়ে বিক্রি কমে যায় এক সময়ের জনপ্রিয় পানীয় কোকাকোলার। আমাদের দেশে কোকাকোলার পরিবর্তে মানুষ খুঁজে নিয়েছে বিভিন্ন পানীয়। এছাড়া গাজায় ইসরাইলের হামলাকে কেন্দ্র করে বয়কটের ডাকে বিখ্যাত ফাস্ট ফুড চেইন ম্যাকডোনাল্ডস লোকসানের মুখে পরে। একজন দায়িত্ববান মুমিন কখনও বয়কটের ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে না। সম্প্রতি , ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলকে

‘গণহত্যাকারী রাষ্ট্র’ আখ্যা দিয়েছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ। সেই সাথে ইসরাইলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষনা দেন তিনি। [82]

৬। সুদের ভয়াবহতা মারাত্নক । ইহকালীন ও পরকালীন উভয় দিকেই শাস্তি ও লাঞ্ছনা । সমাজের দরিদ্ররা এর মূল ভুক্তভুগী । একজন মুমিন সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে তাই সুদকে প্রতিহত করতে হবে। এজন্য কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হতে পারে যেমনঃ তরুন সমাজকে সুদের ভয়াবহতা প্রচার করতে হবে তাদের লেখনীয় মাধ্যমে , মসজিদের খুতবায় বয়ান , কর্জে হাসান দেয়া ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

[82] https://insaf24.com/news/15/05/2025/214708

উপসংহার

ইসলামের ইনসাফ ও সুবিচারকে বলা যায় ,জমিনের ওপর আল্লাহর মানদণ্ড। তিনি একমাত্র বিধানদাতা। দুনিয়া এবং আখেরাতে সবাই সুবিচার পাবে কেবল রবের কাছে। এজন্য ,আল্লাহর ভয় ও তাকওয়ার আদলে যে সমাজ বা রাষ্ট্র গড়ে উঠবে সেই সমাজেই ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা হবে নিশ্চিতরূপে। ইনসাফ এমন একটি মহৎ গুন যার ফলে মানুষের প্রিয়ভাজন হওয়া যায়। নবীজি (সাঃ) তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।শান্তি ও সুখের চাবিকাঠি আছে কেবল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায়। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে মানুষ আজ নিজেকে বিজিত ভাবছে । এভারেস্ট জয় হোক বা মহাসাগরে ডুব দিয়ে মুক্তা কুড়িয়ে আনা হোক মানুষ নিজেকে স্বয়ংসম্পুন আর সুখী ভাবছে। কিন্তু দিন শেষে নিজের গৃহকোণে এক টুকরো সুখের সন্ধান সে খুঁজে পায় না। পরস্পরে বিশ্বাস, ভালোবাসা ও ন্যায়নীতিএর পরশ থাকলে কুঁড়ে ঘরেও শান্তি বিরাজ করে। কিন্তু ন্যায় ছাড়া সুউচ্চ বালাখানা অগ্নিগৃহে পরিণত হয়। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ও পুঁজিবাদ বিশ্বব্যবস্থা মানুষকে ভোগ -বিলাস সামগ্রী উপহার দিয়েছে একথা স্ত্য কিন্তু দিতে পারেনি আত্নিক শান্তি ও সুখ । কারণ সর্বত্র অন্যায় ও বে-ইনছাফীর সয়লাব তা পরিবার হোক আর সমাজে হক।

নবীজি ইনসাফহীনতাকে তুলনা করেছেন 'হাশরের ময়দানে ঘোর অমানিশা'-এর সাথে।যারা অবিচার করবে তাদের আখিরাত ঘোর অন্ধকার'।[83] এখানে হাশরের ময়দানে অন্ধকারের উপমাটি প্রতীকী। এর মানে বেইনসাফি এবং জুলুমের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীকে যে অন্ধকার যুগে নিয়ে যায়, হাশরের ময়দানে সেই অন্ধকারই তাদের আচ্ছন্ন করবে। বেইনসাফি বা অবিচার সমাজ থেকে শান্তি এবং স্থিতিশীল উন্নয়নকে নির্বাসিত করে। এটি পৃথিবীর মানুষকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সৌভ্রাতৃত্বের বদলে প্রতিহিংসা, অনৈক্য, সংঘাত ও সংঘর্ষের দিকে চালিত করে। বেইনসাফি এবং ইসলাম একসাথে সহাবস্থান করতে পারে না। অবিচারের ইসলামী পরিভাষা হচ্ছে 'জুলুম'। এই জুলুম বলতে শুধু বিচার ব্যবস্থায় বিপর্যয় নয়; বরং সমাজ ও রাষ্ট্রে যেকোনো অসাম্য, অবিচার, প্রতারণা, মিথ্যাচার, অধিকার হরণ, মানুষের মর্যাদার হরণ, মর্যাদার লঙ্ঘন সবকিছুকেই বুঝায়। [84]

ইসলামের বাইরে যত মতবাদ আছে তা বাহ্যত যতই কল্যাণকর মনে হোক;আসলে তা মরিচিকা। তা ইনসাফের খোলসে আসলেও যুলুমের মাকাল ফল ছাড়া কিছু নয় ।আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা। আজকের আধুনিক সমাজে ইসলামের

[83] 'সহিহ মুসলিম, ভল্যুম-৪, পৃ: ১৯৯৬, Kitab al-Birr wa al-Silah wa al-Adab, Bab Tahrim al-Zulm,

[84] Chapra, ১৯৮৫, পৃ: ২৭-২৮

ন্যায়বিচার প্রয়োগ অসম্ভব কিছু না যদি মুসলিম উম্মাহ এক হয় । তবে , কোন পরিবর্তন একদিনে হয় না ।ধাপে ধাপে হয় । আমাদের তাই শুরু করতে হবে সম্ভাব্য উপায়গুলো দিয়ে। এই কাফেলায় আহবান জানাতে হবে আরো মুসলিম ভাইবোনকে যেন আমরা সবাই মিলে একটি ইনসাফভিত্তিক সমাজ গড়তে পারি। ইসলামের ন্যায়বিচারের যে মূলনীতি বা যে বিস্ময়কর ঘটনাগুলো আছে সেগুলোকে সামনে রেখে আধুনিক সমাজে তার প্রয়োগ করতে হবে। ইসলামের ন্যায়বিচারের লক্ষ্যকে পূরণ ছাড়া আমাদের এখন আর অন্য পথ সামনে খোলা নেই কারন , মানব রচিত আইন আজ অচলের পথে। পশ্চিমা বিশ্ব আমাদের মানবাধিকার রক্ষার স্বপ্ন দেখায় কিন্তু , বাস্তবে তার প্রতিগল আমরা দেখিনা । আমাদের মুসলিমদের আজ জাগতে হবে এই আধুনিক সময়ে ইসলামের ন্যায়বিচার প্রয়োগের সকল উপায় ধরে তা বাস্তবায়ণের ব্যবস্থা করতে হবে। দিকে দিকে মাজলুমের কান্না আমাদের একতাই ঘুচিয়ে দিবে । আমাদের ফিলিস্তিনবাসী ভাই-বোনকে ইনসাফের দুনিয়া উপহার দিতে হবে। আরো যত মাজলুম আছে সবার জন্যিই আমাদের একই চাওয়া। ইনশাআল্লাহ , আধুনিক সমাজেও ইসলামের ন্যায়বিচার প্রয়োগ হয় তা মুসলিম উম্মাহ দেখাতে পারবে তাদের ঐক্যর বলে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। শায়খ আব্দুল মাজেদ মুজাহিদ ,মুসলিম ইতিহাসের সোনলী বিচার

২। অধ্যাপক শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, সুদ: এক ভয়াবহ অভিশাপ পরিত্রাণের উপায়

৩। বিচারপতি শাইখ আবদুল হাকিম হককানি ,ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা ,ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসন-ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা

৪। মুফতি তারেকুজ্জামান, ইসলামি জীবনব্যবস্থা

৫। সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, ইসলামে সামাজিক সুবিচার

৬ ।ড. রাগিব সারজানি, মুসলিম জাতি বিশ্বকে কি দিয়েছে ১ম ও ৩য় খন্ড

৭। ড. রাগিব সারজানি, ইসলাম দিয়েছে সবার অধিকার

৮।মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন, ইসলামে মানবাধিকার

৯। আল বাহি আল খাওলী , ইসলামে নারী

অন্যান্য

ড. এম উমর চাপরা ,মাকাসিদ আল-শরিয়াহর আলোকে উন্নয়ন ইসলামিক মডেল

শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচার

ড. মুহাঃ মিজানুর রহমান, শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ স.-এর সামাজিক ন্যায়বিচার ইসলামী আইন ও বিচার ,বর্ষ: ১১ সংখ্যা: ৪২,এপ্রিল-জুন: ২০১৫

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ইনছাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা, মাসিক আত তাহরিক

কুরআনে নারীর অধিকার : প্রসঙ্গ মীরাছ, জুমাদাল আখিরাহ ১৪৩২, মে-২০১১ , মাসিক আল কাউসার